আফ্রিকার জঙ্গলে



ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট—২৩শে মে, ১৯৪০]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পঞ্চদশ সংস্করণ—১৩৬৮

মুদ্রাকর

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনারসিংহ প্রেস

৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা

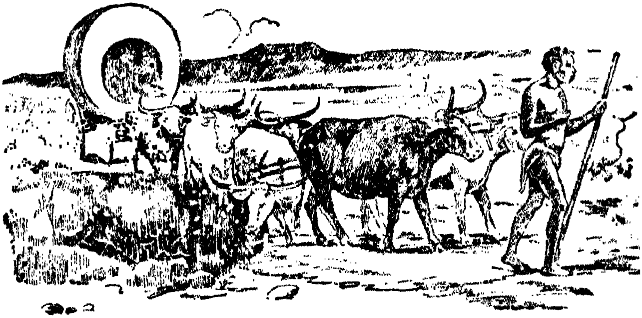
লালগোলার কুমার
শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের
করকমলে—

নিবেদন

গল্পটি 'শিশু-সাথী'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এটিকে রচনা কর্‌তে আমাকে বিলাতী গ্রন্থের কিছু সাহায্য নিতে হয়েছে। গল্পটি যদি ছেলেদের ভাল লাগে তা' হলেই আমার শ্রম সার্থক।

কলিকাতা }
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ }

গ্রন্থকার



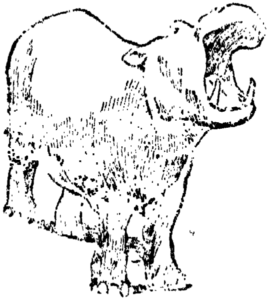
আফ্রিকার জঙ্গলে

এক

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকার নাম শোনে নি, এমন ছেলে কেউ আছে কি ? এই দেশেরই একটা গল্প বল্‌ছি।

আফ্রিকা দেশটা যেন একটা চিড়িয়াখানা। তার মধ্যে কত রকম জন্তু-জানোয়ার ও পাখীর যে আড্ডা, নাম ক'রে শেষ করা যায় না। তবু গোটা কয়েকের নাম কার—হাতী, জলহাতী, গণ্ডার, জীরাফ, জেব্রা, বুনো গাধা, বুনো মাহষ, নূ, হরিণ, চিতাবাঘ, অজগর ও বিষধর সাপ, বেবুন, শিম্পাঞ্জী, ওরাঙ্‌-ওটাঙ্‌, উটপাখী, হাতুড়ীপেটা-পাখী, মাছ-

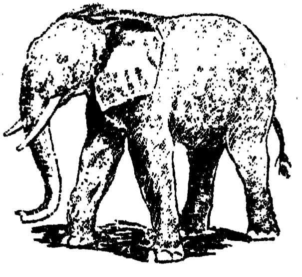
পাখী, চৌকীদার-পাখী ও স্বয়ং পশুরাজ সিংহ। তা'ও আবার দু'দশটা নয়—গালে পালে, হাজারে হাজারে। কিন্তু একটা



জলহাতী

খুব আশ্চর্য্যের কথা—এহেন আফ্রিকায় বাঘ নেই। সে অবশ্য একপক্ষে ভালই বল্‌তে হবে। কেননা, এক পশুরাজের প্রতাপেই প্রাণিগণ "ত্রাহি, ত্রাহি" করে; তার সঙ্গে আবার ব্যাঘ্রমশায় যোগ দিলে—কি কাণ্ড যে হ'ত, তা' ভাবতেও ভয় হয়। বোধ হয়, দু'দিনেই সব সাবাড় হয়ে যেত।

আবার এই সিংহের চেয়েও বিক্রমশালী আর এক রকম জন্তু আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে বাস করে। তার নামটাও বোধ হয় সকলে শুনেছ। সে প্রাণীটা হ'ল গরীলা। গরীলার চেহারাটা না-বানর না-মানুষ। সারা গা কালো লোমে ঢাকা, পালো-য়ানের চেয়েও চওড়া বুক, পেশীওয়ালা লম্বা দু'খানা হাত, কদাকার মুখ—দাঁতগুলো



আফ্রিকার হাতী

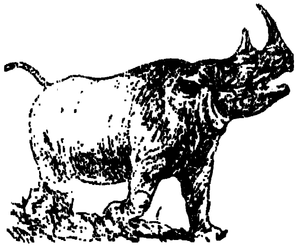
লম্বা ও ছুঁচলো, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, দুষ্টুমী ও হিংস্রতায় ভরা। পিছনের পা দুটো শরীরের অনুপাতে একটু ছোট। বানরের মত ওরা গাছে চড়্‌তে পারে না; অবশ্য একেবারেই যে পারে না, তা' নয়। একটা পালোয়ানের গায়ে যতই জোর থাক্ না, তার সাড়ে-তিন-মণি শরীর নিয়ে গাছে চড়া কি সহজ ব্যাপার? গরীলাদের গায়ে অসুরের মত শক্তি। একটা গরীলা এক ঘুষিতে খুব বড় পালোয়ানেরও মাথার খুলি মাটির হাঁড়ির মত ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে পারে। কিন্তু তাদের খাদ্য কি জান?—ফল-ফুল ও বৃক্ষ-লতার কচি পাতা। তাতেই গায়ে এত জোর! যে সব বনে গরীলা বাস করে, সেগুলো লোকালয়



থেকে বহু ক্রোশ দূরে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের কোলে, আর খুব নির্জ্জন ও গভীর। তার মধ্যে সূর্য্যের আলো তেমন ভাবে পড়ে না। দিন-দুপুরেও একটা তরল অন্ধকার বনতল ভ'রে রাখে। স্বয়ং পশুরাজও এ সকল বনে প্রবেশ কর্‌তে ভয় পান; তার ওপর অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু মানুষের অগম্য স্থান কি আছে? তাকে ঠেকায় কে?

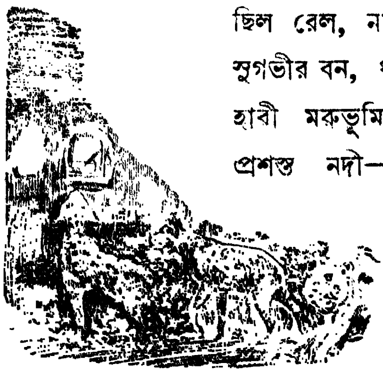
আফ্রিকার জঙ্গলে

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে ডার্ব্বান নগর। একবার সেই নগরের তিনটি ভারতীয় বণিকের ছেলে শোভনলাল, বীরেন্দ্র ও রতন—এই গরীলা শিকার করতে গিয়েছিল।



গণ্ডার

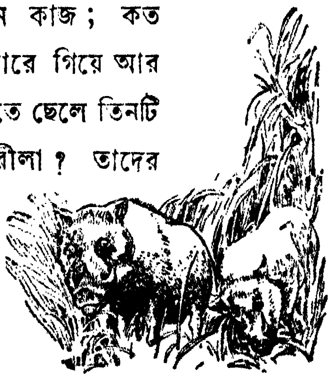
যে বনভাগে গরীলার বাস, ডার্ব্বান থেকে তা' কয়েক শ' ক্রোশ দূরে। যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন সেদিক্ পানে না ছিল রেল, না ছিল কোন রাস্তা। দীর্ঘ সুগভীর বন, ধূ ধূ প্রান্তর, বিরাট কালা-হারী মরুভূমি, মাঝে মাঝে পাহাড়মালা, প্রশস্ত নদী—পথিককে ঘোড়ায়, গো-গাড়ীতে বা হেঁটেই পার হয়ে যেতে হ'ত। তাতে বিপদের অন্ত ছিল না। পথের মাঝে



বুনো কুকুর

হিংস্র জন্তুর মুখে, কি নিগ্রোদের হাতে বা তৃষ্ণায় অথবা অসুখে প্রাণ হারাতে হ'ত। তবু উৎসাহ ও সাহস যাদের আছে তা'রা কি ওতে ভয় পায়?

এই ছেলে তিনটি ছিল যেন ডাকাত! ভয়-ডর কা'কে বলে তা' তা'রা জান্‌ত না। কোন বাধা-বিপত্তি তা'রা মান্‌ত না—গায়ে ছিল অসুরের মত জোর। ঘোড়ায় চড়্‌তে, বন্দুক, ছোরা ও লাঠি চালাতে তা'রা ছিল ওস্তাদ। ডার্ব্বানের চারধারের বন-জঙ্গলে শিকারের চোটে প্রাণীগুলোকে তা'রা অস্থির ক'রে তুলেছিল। শেষে সিংহ শিকার ক'রেও তাদের তৃপ্তি হ'ত না। ওদের চেয়েও ভয়ঙ্কর জানোয়ার শিকার করা চাই। শিকারে যদি বিপদের সম্ভাবনা না থাক্‌ল তবে সে শিকারে আবার আনন্দ কি? তা'রা শুনেছিল, গরীলা শিকার বড় কঠিন কাজ; কত ওস্তাদ শিকারী গরীলা শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। এই ডাকাতে ছেলে তিনটি নেচে উঠ্‌ল—কোথায় সে গরীলা? তাদের শিকার কর্‌তেই হবে। যে কথা সেই কাজ। একদিন গোপনে তিন বন্ধুতে বাড়ী থেকে রওনা হ'ল গরীলার



বুনো শূকর

সন্ধানে। সঙ্গে নিলে শিকারের নানা উপকরণ, কাঠের দুটো বড় বাক্স বোঝাই ক'রে রঙিন কাচের মালা, পিতল-তামার চুড়ী-বালা, রঙিন কাপড় আর পথ-প্রদর্শকরূপে মাকৃরুরু নামে একজন নিগ্রোকে। তাদের যান-বাহন হ'ল এক আট-বলদে টানা গাড়ী।

কাচের মালা, চুড়ী-বালা, আর আট-বলদের গাড়ীর কথা শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, শিকার কর্‌তে আবার এসব দরকার হয় নাকি? হয়; ওদেশে এগুলোর বড় দরকার। কেন, তা পরে বল্‌ছি। তার আগে যে গল্প বল্‌ব, সে গল্প শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে।

দুই

তা'রা চলেছে—

প্রথম দিন তাদের বনে বনেই কেটে গেল। না পেল একটু সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে—না পড়্‌ল চোখে আকাশখানা। বনের আড়ালেই সূর্য্য উঠ্‌ল, বনের আড়ালেই ডুবে গেল। রাতের বেলা তা'রা একটা গাছের তলায় আস্তানা কর্‌লে; কিন্তু কারো চোখে ঘুম এল না। গোটা কয়েক বুনো কুকুর, হায়েনা ও একটা সিংহ তাদের আস্তানার চারধারে ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেড়াল।

পরদিনও সেই বন; তার পরদিনও তাই। এ বনের যেন শেষ নেই। কিন্তু চতুর্থ দিন সকাল থেকেই বনটা পাত্‌লা হতে সুরু কর্‌লে এবং দুপুরের দিকে এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ শেষ হ'ল।

শেষ হ'ল বটে, কিন্তু সাম্‌নেই পড়্‌ল আবার বিরাট এক জঙ্গল। তার মাঝে মাঝে তাল-খেজুরের গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে একটানা হাওয়ায় সর্‌-সর্‌ শব্দে দুল্‌ছে।

তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড তেজ; তেমন ছায়া সে জঙ্গলে ছিল না। সেই ছায়াহীন পথে কতক্ষণই বা চলা যায়? তার মধ্য দিয়ে কিছুদূর চ'লেই বলদগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়্‌ল। তৃষ্ণায় শিকারীদেরও গলা শুকিয়ে কাঠ। সঙ্গে পিপেতে সামান্য জল ছিল, টানাটানি ক'রে খেলে তা' কেবল তাদেরই কুলোতে পারে। অথচ বলদগুলোকেও অন্ততঃ একটু জল ও বিশ্রাম না দিলে আর চল্‌বার উপায় নেই।

রতন ছিল তিন বন্ধুর মধ্যে সব চেয়ে বয়সে ছোট। সে টপ্‌ ক'রে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে প্রায় সিকি মাইল দূরে বাঁ দিকে যেখানে একটা খেজুরকুঞ্জ দেখা যাচ্ছিল, তার দিকে ছুট্‌ল। তার আশা ছিল, সেখানে জল না পাওয়া গেলেও ছায়া তো পাওয়া যাবে। বিশ্রামের পক্ষে সেইটেই আগে দরকার। সেখানে পৌঁছে সে ছায়া তো পেলেই—তার আশার অতীত আর একটা জিনিস তার চোখে পড়্‌ল,—একটা মাঝারি গোছের লম্বা খেজুরগাছের গোড়ায় একটা গর্ত্তে খানিকটা জল। জল দেখে প্রথমে তার খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই খুব আশ্চর্য্য ঠেক্‌ল এই ভেবে যে, তেমন জায়গায় বিশেষ ক'রে ঐ খেজুরগাছটার গোড়ায়—কি ক'রে জল আস্‌তে পারে? ক'দিন এ অঞ্চলে বৃষ্টির নাম-গন্ধও

নেই। তবে? সে চীৎকার ক'রে শোভনলাল ও বীরেন্দ্রকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। তা'রাও ততক্ষণে নেমে সেই দিকে ছুটছে। মাক্‌রুরুও তাদের সঙ্গে ছিল। গাছটার গোড়ায় পৌঁছে, সেখানে এমন ব্যাপার দেখে তা'রাও অবাক্! সকলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই গাছের মাথা থেকে এক ফোঁটা স্বচ্ছ জল সেই গর্ত্তের মধ্যে টপ্ ক'রে ঝ'রে পড়্‌ল। সকলে ওপরপানে তাকালে; কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

হঠাৎ মাক্‌রুরু হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল; বল্লে—"ঐ দেখুন হুজুর, জল-ঝরানো পোকার দল, গাছের ডালে কেমন চাব্‌ড়া বেঁধে আছে। ও পোকা এ অঞ্চলে অনেক।"

সকলে দেখ্‌লে গাছের ডালে এক থোকা খেজুরের মত—গোবরে-পোকার চেয়েও আকারে বড় কতকগুলো পোকা।

মাক্‌রুরু আরও বল্লে—"ওরা এক রাত্তিরে প্রায় দেড়সের জল ঝরায়। ওদের পেটের মধ্যে নদী আছে।"

রতন বল্লে—"কি ক'রে বুঝ্‌লি?"

—"আমরা জানি, হুজুর। না হলে এত জল ওরা পায় কোথা থেকে? এ জল দিন-রাতই ঝর্‌ছে তবু ফুরোয় না!"

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু পোকাগুলো গাছের গুঁড়ি থেকে

রস ও হাওয়া থেকে জলীয় বাষ্প শরীরে টেনে নিয়ে তাই ঝরায়। যা' হোক্ কথাটা ব'লেই মাক্রুরু কান খাড়া ক'রে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন শুন্‌তে লাগ্‌ল।

তার রকম দেখে তিন বন্ধু হেসেই অস্থির।

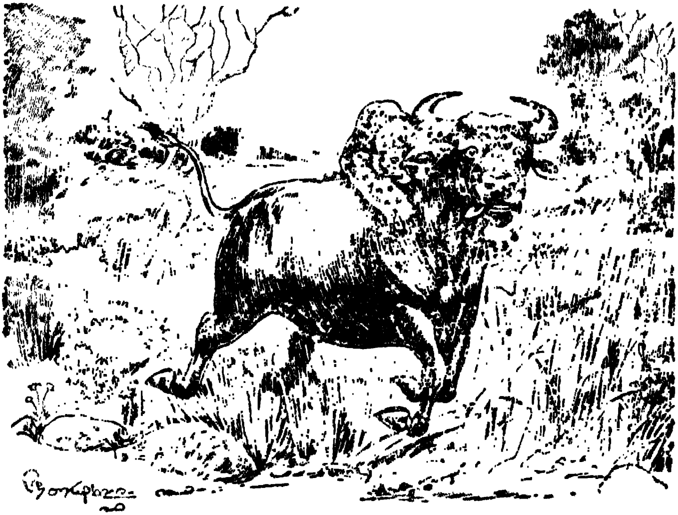
বীরেন্দ্র বল্লে—"তোর যখন এত বুদ্ধি, তখন তোর নাম রাখ্‌লাম—মঙ্গরু।"

মঙ্গরু কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে তেমনই উৎকর্ণ হয়ে রইল; তারপর বল্লে—"শুন্‌তে পাচ্ছেন হুজুর?"

হুজুররাও তখন শুন্‌তে পেয়েছেন। সেই জঙ্গলা জায়গার একধার থেকে একটা অস্বাভাবিক শব্দ আস্‌ছে। কিন্তু শব্দটা দূর থেকে আস্‌ছিল ব'লে, সেটা কিসের শব্দ ঠিকমত কেউই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না। শব্দটাকে কখনও মনে হতে লাগ্‌ল মেঘ-গর্জ্জন, কখনও কোন প্রকাণ্ড প্রাণীর আর্ত্তনাদ। কিন্তু এটা সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, শব্দটা ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। তা'রা চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে; কিন্তু জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়্‌ল না।

দিন-দুপুরে এ কি কাণ্ড! তিনজনেই বন্দুক হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে শব্দটাও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবার সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌লে শব্দটা

একটা ক্রুদ্ধ বুনো মহিষের হাঁক। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাঁকটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল মহিষটা যেন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছে। মাটিতে তার পায়ের শব্দ ও জঙ্গলের ডালপালা ভাঙার আওয়াজ শোনা যেতে লাগ্‌ল।



মঙ্গরু আর সেখানে দাঁড়াল না—এক দৌড়ে গিয়ে একটা খেজুরগাছ বেয়ে উঠে' তার মাথায় চ'ড়ে রইল। মহিষটাও দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের সাম্‌নে কিছুদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় ছুটে এল। তা'রা দেখ্‌লে তার পিঠে একটা

প্রকাণ্ড চিতাবাঘ ঘাড় কাম্‌ড়ে ধ'রে পিঠের মাংসের মধ্যে চারটি থাবার নখ চালিয়ে ব'সে আছে। রক্তধারায় মহিষটার কালো গা লাল। যন্ত্রণায় ও রাগে তার মুখ-চোখের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, লাল চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ে আর কি! ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়্‌ছে, আর মুহুর্মুহু হাঁক ছাড়্‌ছে। মহিষটা সেই ফাঁকা জায়গাটা জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য সুরু ক'রে দিলে। চিতাবাঘটাকে ঘাড় থেকে ফেল্‌বার চেষ্টায় কত কৌশল কর্‌তে লাগ্‌ল। কখনও নক্ষত্রবেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়, কখনও পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ঘোড়ার মত শীষ্‌-পা হয়ে ওঠে, কখনও মাটিতে চোখা চোখা প্রকাণ্ড শিঙ দুটো চালিয়ে দেয়, আবার কখনও ছুটে গিয়ে বিপুলবেগে তালগাছের গায়ে প্রকাণ্ড ধাক্কা মারে। তবুও চিতাবাঘটাকে সে ঘাড় থেকে ফেল্‌তে পার্‌লে না। জানোয়ারটা আঠার মত তার ঘাড়ে-পিঠে লেগে রইল!

তখন মহিষটা আরও ক্ষেপে উঠ্‌ল। তার হাঁকে সারা বন কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে আবার ছুট্‌ দিলে, কিন্তু এবার সোজা শিকারীদের দিকে। শিকারীরাও তিনজনে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে ছুটে গিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে কিছু দূরে দূরে তিনটি খেজুরগাছে পিঠ দিয়ে রাইফেল

হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু রক্তধারায় মহিষটার চোখ দুটো তখন ঝাপ্‌সা। তার দৃষ্টি আর কোন দিকে ছিল না। তবু চিতাবাঘটাকে ঘাড় থেকে ফেল্‌বার চেষ্টাতেই ঘুরপাক দিতে দিতে হঠাৎ গিয়ে পড়্‌ল ঠিক তাদের সাম্‌নে—মাত্র হাত কুড়ি দূরে। তখন আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করা চলে না। কিন্তু তিনজনের মাথায় খেয়াল চাপ্‌ল, কেবল মহিষটাকে মার্‌লেই হবে না, চিতাবাঘটাকেও ঐ সঙ্গে গুলি কর্‌তে হবে। অথচ চিতাবাঘটাকে যদি আগে গুলি করে, মহিষটাও মুক্তি পেয়ে পালাবে। আবার মহিষটাকে আগে মার্‌লে, চিতাটা সেই সুযোগে স'রে পড়্‌বে! ভাবনাটা তাদের মনের মাঝে ঘুরে গেল নিমেষ মাত্র। তার বেশী সময় তা'রা তখন নষ্ট কর্‌বে কি ক'রে?

হঠাৎ সারা বন কাঁপিয়ে তিনটি রাইফেল একসঙ্গে আওয়াজ ক'রে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মহিষটার গায়ে গুলি লাগার আওয়াজ শোনা গেল এবং রাইফেলের ধোঁয়া স'রে যেতেই তা'রা দেখ্‌লে, মহিষটা হুম্‌ড়ি খেয়ে মাটিতে প'ড়ে গেছে, তার ঘাড়ের ওপর চিতাটা নেই। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। মহিষটা একটা হাঁক ছেড়ে আবার সোজা উঠে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে—তার সাম্‌নে তিনটি নূতন শত্রু। শোভনলাল ছিল তার অনেকটা কাছে। ভীষণ রাগে

সে আর একটা বিকট হাঁক ছেড়ে তাকেই তাড়া করলে। শোভনলালের পক্ষে মহিষটাকে গুলি করার সুবিধা ছিল; কিন্তু রাইফেলে তার তখন একটি মাত্র গুলি। সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। অথচ এমন সময়ও নেই যে, রাইফেলে সে আবার গুলি ভ'রে নেয়। বীরেন্দ্র ও রতন বন্ধুর বিপদ্ বুঝ্তে পেরে মহিষটাকে গুলি করবার আগেই মহিষটা তাদের সাম্নের উঁচু জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকে পড়্ল। তবু তা'রা দু'জনে জঙ্গলটা ঘুরে পার হয়ে শোভনলালের দিকে ছুটে দিল।

কিন্তু শোভনলালের অবস্থা তখন বড় সঙ্গীন। সে ছুট্তে ছুট্তে রাইফেলে গুলি ভর্তে গিয়ে জঙ্গলের মাঝে একটা মোটা লতায় পা আটকে প'ড়ে গেল, উঠ্বার চেষ্টা ক'রেও উঠ্তে পার্লে না। মহিষটা ততক্ষণে বন-জঙ্গল ভেঙে একেবারে তার হাতখানেক দূরে গিয়ে পড়্ল। বীরেন্দ্র ও রতন এ ব্যাপার দেখে চীৎকার ক'রে উঠ্ল—"শোভন, সাবধান।"

শোভন কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর বিপদেও ধৈর্য্য এবং সাহস হারায় নি। সে লতাজাল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্ছিল। এবার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লতাগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে সোজা উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে রাইফেলে তার গুলি ভরাও হয়ে গেছে। দাঁড়িয়েই দেখ্লে,

সাম্‌নে তার মৃত্যু গর্জ্জন কর্‌ছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের তফাৎ। মহিষটা শিঙ নীচু ক'রে শোভনলালকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার আগেই সে একসঙ্গে যোড়া-গুলি মেরে তার মাথার হাড় গুঁড়িয়ে ফেল্‌লে। গুলি দুটো একেবারে মগজের মধ্যে সেঁধিয়ে মহিষটার হাঁক-ডাক ও লম্ফ-ঝম্ফ— সব শেষ ক'রে দিলে। সে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রকাণ্ড মাংসের ঢিপির মত শোভনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌ল। বীরেন্দ্র এবং রতনও ঠিক তখনই ছুটতে ছুটতে এসে আনন্দে বন্ধুকে জড়িয়ে ধর্‌লে।

কিন্তু চিতাটা পালিয়ে যেতে সকলেরই বড় দুঃখ হ'ল। বিশেষ ক'রে দুঃখিত ও লজ্জিত হ'ল বীরেন্দ্র। সে মহিষটাকে গুলি না ক'রে চিতাবাঘটাকেই গুলি করেছিল। এত অল্পদূর থেকে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া তার মত শিকারীর পক্ষে কি কম লজ্জার কথা? ওদিকে বেলাও তখন প্রায় প'ড়ে আস্‌ছে। আর দেরী করাও চলে না। মহিষটাকে সেখানে ফেলে তিন বন্ধুতে সেদিনকার শিকারের সম্বন্ধে গল্প করতে কর্‌তে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

রতন ছিল সকলের আগে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ সে পিছন ফিরে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বীরেন্দ্র ও শোভনলালকে চুপ কর্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লে। সে দেখ্‌লে তার সাম্‌নে

জঙ্গলটার মধ্যে একটা চিতাবাঘ ওৎ পেতে ব'সে আছে। সে রাইফেল তুলে চিতাটাকে গুলি করতে যেতেই পিছন থেকে শোভনলাল হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠ্ল।

—"কি? ব্যাপার কি?"

—"ওটা যে মরা চিতাবাঘ! ঐ দেখ ওর কপাল থেকে রক্ত পড়্ছে।"

সত্যই তো। রতন ছুটে' গিয়ে তার লেজ ধ'রে বাইরে টেনে আন্ল।

মঙ্গরু এতক্ষণ সেই খেজুরগাছের ওপর থেকে সব ব্যাপার দেখ্ছিল; এবার নির্ভয়ে গাছ থেকে নেমে মহা উল্লাসে তাদের কাছে ছুটে' এল। সব চেয়ে আনন্দ হ'ল তারই বেশী। মহিষের মাংস অনেকদিন খাওয়া হয় নি। যোগাড়ও হয়েছে একটা গোটা মহিষ। কিন্তু যখন শুন্লে যে তা'রা মহিষটাকে নেবে না, এমন কি তার শিঙ যোড়া এবং ছালখানাও না, তখন দুঃখে বেচারার চোখে জল এল। সে বল্লে—"হুজুর, তবে নেবেন কি?"

—"ঐ চিতাবাঘটার চামড়াখানা। যা ওটাকে ঘাড়ে ক'রে গাড়ীর কাছে নিয়ে। সেখানেই ওর ছালখানা ছাড়াব।"

—"কিন্তু হুজুর, আমার যা ক্ষিধে পেয়েছে; আর ওদিকে গাড়ীতে মাংসও নেই।"

—"তা' হোক্, তুই চল, তোকে ভাল মাংস খাওয়াব।"

—"ভাল মাংস আর কোথায় পাবেন? তবে এই চিতা-বাঘটাকেই খাব।"

তারপর গাড়ীর কাছে ফিরে এসে সকলে মিলে খুব তাড়াতাড়ি চিতাবাঘটার ছালখানা ছাড়িয়ে নিলে; কিন্তু মঙ্গরু বেচারার ভাগ্যে চিতার মাংসও জুটল না। বলদগুলো বিশ্রাম করতে পেয়ে এতক্ষণে কিছু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

আবার তা'রা চল্ল। ওদিকে বেলাও আর বেশী নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই জঙ্গলটা পার হয়ে আর একটা বনের মধ্যে ঢুকতেই আবার এক মজার ব্যাপার ঘটল।

তা'রা শুনতে পেল দূর থেকে কা'রা যেন মৃদু মৃদু ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তাদের দিকে ছুটে' আসছে। সেই গহন বনে আবার ঘণ্টা বাজায় কা'রা? রাজার ডাক নাকি? ঘণ্টা যা'রা বাজাচ্ছিল তা'রা শীঘ্রই তাদের সম্মুখে দেখা দিল। একটা প্রকাণ্ড ইলাণ্ডের (এক রকম হরিণের) পিছনে গোটা চারেক বুনো কুকুর। কুকুরগুলোর গায়ের রং মেটে। আকারেও খুব বড় নয়—আমাদের রাস্তা-ঘাটে যে সব কুকুর ঘুরে বেড়ায় তাদেরই মত। কিন্তু চোখ দুটো হিংস্রতায় ধক্-ধক্ করছে। জিভ্ বেরিয়ে প'ড়েছে—আর তা' থেকে টস্-টস্ ক'রে জল ঝরছে।

হরিণটা ছিল কুকুরগুলোর সমুখে—হাত কয়েক দূরে। তার ছোট্‌বার রকম দেখে মনে হ'ল সে বড় ক্লান্ত, আর ছুটতে পারে না। হরিণটা ছুটতে ছুটতে শিকারীদের সাম্‌নে এসেই কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। পিছনে কুকুর, সমুখে শিকারীরা—সে যেই একদিকে ঘুরে ছুটে' পালাতে যাবে অমনি দুটো কুকুর তার ওপর লাফিয়ে পড়্‌ল। একটা কাম্‌ড়ে ধর্‌ল তার পিছনের একখানা ঠ্যাং, আর একটা তার গলা। হরিণটা তাদের মুখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চর্‌কীর মত ঘুরপাক দিতে সুরু কর্‌লে। কুকুরগুলোও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। সে এক মজার দৃশ্য। কিন্তু বেশীক্ষণ দেখা সুবিধা হবে না ভেবে, তিনবন্ধু বন্দুক উঁচিয়ে ধর্‌লে। আর একটু হলে হরিণটাও পালাত। তারপর তিন শিকারীর তিনটি গুলিতে হরিণটা ও কুকুর দুটো চারপা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়্‌ল। আর বাকী কুকুর দুটো ব্যাপার দেখে লেজ গুটিয়ে বনের আড়ালে সোজা দৌড়।

ওদিকে বেলাও প'ড়ে এল। বনতল অন্ধকার। ঝিঁঝি-গুলো ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে। জোনাকীরা পাতার আড়াল থেকে পিট্‌-পিট্‌ কর্‌তে কর্‌তে একে একে বেরিয়ে পড়্‌ল। বনের মধ্যে আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তা'রা সেইখানে রাতের মত আস্তানা গাড়্‌লে। চারদিক্‌ থেকে শুক্‌নো



পিছনে কুকুর—সমুখে শিকারীরা

ডালপালা কুড়িয়ে এনে দু' জায়গায় জড় ক'রে তা'রা তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর খাবার পালা। সকলে সেই আগুনে হরিণের মাংস পুড়িয়ে নুন ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে খেতে লাগ্‌ল। খেতে খেতে ঠিক হ'ল, তিন শিকারী একে একে জেগে রাতখানা পাহারা দেবে।

তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে যে যা'র মত শুয়ে পড়্‌ল। একটা গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে টোটাভরা রাইফেল হাতে সেই অন্ধকারে জেগে রইল কেবল শোভনলাল। রাতের প্রথমভাগে পাহারার ভার প'ড়েছিল তার ওপর।

বলদগুলোর ভাগ্যে কিন্তু সে রাতে এক ফোঁটাও জল জুট্‌ল না।

তিন

পরদিন তখন বনের মাথায় রোদ চিক্-চিক্ কর্‌ছে। তা'রা রওনা হবে, এমন সময় জন ছয়েক নিগ্রো এসে তাদের সাম্‌নে দাঁড়াল। লোকগুলোর হাতে সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ বর্শা; চেহারা সেই নাক খাঁদা, উল্টানো পুরু ঠোঁট, মাথায় কালো কোঁক্‌ড়া চুল, গায়ের রং পাকা জামের মত। কিন্তু সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও লম্বা। শিকারীরা কিছু বল্‌বার আগেই তা'রা বল্লে—"হুজুর, কিছু দূরে একপাল হাতী আছে, শিকার কর্‌বেন তো চলুন।"

বাস্তবিক পক্ষে, শিকারীরা তো গরীলা ছাড়া আর কিছু শিকার কর্‌তে বেরোয় নি! গরীলারা যে বনে বাস করে, সে বহুদূর। পথে শিকার কর্‌তে কর্‌তে গেলে কবে যে সেখানে পৌঁছনো যাবে ঠিক নেই। তাদের ইচ্ছা ছিল, সাম্‌নে যা পড়্‌বে, শুধু তাই শিকার কর্‌বে। কিন্তু রতনের বড় ইচ্ছা হ'ল হাতী শিকার করে। বীরেন্দ্র এবং শোভনও তাই নিগ্রোদের কথায় রাজী হয়ে পড়্‌ল। ঠিক হ'ল মঙ্গরু



জন ছয়েক নিগ্রো এসে তাদের সাম্‌নে দাঁড়াল

প্রথমে জলের সন্ধান ক'রে সেই অবসরে বলদগুলোকে জল খাইয়ে আন্‌বার ব্যবস্থা করবে। তারপর তা'রা ফিরে না আসা অবধি সেখান থেকে কোথাও যাবে না।

মঙ্গরু বল্লে—"আচ্ছা। কিন্তু হাতীর মাংস বড় মিষ্টি। হুজুর, আমার জন্যে খানিকটা যেন থাকে।" ব'লে সে একলাফে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা'রাও আর সময় নষ্ট না ক'রে নিগ্রোগুলোর সঙ্গে রওনা হ'ল। আস্তানা পাহারায় রইল একা ডেম্বা—তাদের নিগ্রো গাড়োয়ানটা।

গভীর বনের মধ্য দিয়ে পথ। নিগ্রোগুলো পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে। চল্‌তে চল্‌তে সাম্‌নে দিয়ে গোটা কয়েক হরিণ ও গোটা দুই বুনো শূয়োর ছুটে পালাল। আবার এক জায়গায় দেখ্‌লে, একপাল বাঁদর কিচির-মিচির শব্দে বন গুল্‌জার ক'রে রেখেছে। শিকারীদের দেখে কয়েকটা মুখ ভেঙ্‌চাতে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে প্রায় ক্রোশ দুই পথ তা'রা চলে গেল, তবু হাতীর পালের দেখা নেই। নিগ্রোদের জিজ্ঞাসা করলেই বলে—"এই এলাম ব'লে।"

তারপর আরও সিকি ক্রোশ পার হয়ে গেল, তবু কোথায় বা হাতী, কোথায় বা কি। তখন তাদের সন্দেহ হ'ল, নিগ্রোগুলোর মনে নিশ্চয় কোন কু-মতলব আছে।

নিগ্রোগুলো তখন কিছুদূরে এগিয়ে গেছে, আর অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা তিনজনে ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ দূর থেকে একটি সুতীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল। না, এবার সত্যই তা'রা হাতীর পালের কাছে এসে পড়েছে। অমনি তিনজনে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই তাদের খুব কাছ থেকে সারা বন কাঁপিয়ে একটা গম্ভীর গর্জ্জন উঠ্‌ল এবং চক্ষের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তেই প্রকাণ্ড একটা সিংহ একলাফে ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। সিংহটা যে নিগ্রোটা সকলের আগে ছিল, তাকে থাবার এক প্রচণ্ড আঘাতে শুইয়ে ফেলে তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে, ভীষণ রাগে নিজেরই পাঁজরা দুটোতে চাবুকের মত সট্‌-সট্‌ ক'রে লেজ আছ্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তখন তার কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কেশরগুলো ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে, আর তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো থেকে থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড—তার পরই বন কাঁপিয়ে রতনের রাইফেলটা আওয়াজ ক'রে উঠ্‌ল—গুড়ুম্! সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রকম ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। তারপরই সিংহটা এক লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিকার পালালে

শিকারীদের মনে বড় কষ্ট হয়। সিংহটা পালিয়ে যেতে সব চেয়ে দুঃখ হ'ল রতনের। যা' হোক্ তা'রা নিগ্রোটার কাছে ছুটে' গিয়ে দেখ্‌লে, বেচারার প্রাণ বেরিয়ে গেছে, মাথার



চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে

খুলিটা থাবার আঘাতে ভেঙে চুরমার! নিগ্রোরা এতক্ষণ গাছের ওপর চ'ড়ে ব'সে ছিল; সিংহটা চ'লে যেতেই একে একে গাছ থেকে নাম্‌তে লাগ্‌ল।

সকলে তখনও গাছ থেকে নামে নি, শিকারীরা মাত্র দু'পা এগিয়ে গেছে এমন সময় সশব্দে ডাল-পালা-গাছ ভাঙতে ভাঙতে দুটো দাঁতাল হাতী ভীষণ রাগে তাদের সাম্‌নে বেরিয়ে এল। হাতীরা এমনভাবে মানুষকে সচরাচর তাড়া করে না। ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক। কিন্তু সে কথা ভাব্‌বার অবসর তখন ছিল না। তিনজনে তিনদিকে দৌড়ে স'রে যেতেই দেখ্‌লে, হাতী দুটোর পিছনে একদল নিগ্রো। তাদের সকলের হাতে বর্শা। তা'রা হাতী দুটোকে তাড়া ক'রে নিয়ে আস্‌ছে। দুটো হাতীরই পাঁজরায় কয়েকটা বর্শা বিঁধে রয়েছে। সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ধারা নেমে গা বেয়ে গাছপালার ওপর টপ্-টপ্ ক'রে ঝরছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিগ্রোর দল হৈ-হৈ শব্দে হাতী দুটোর কাছে এসে পড়্‌ল। জন কতক আবার গাছের ওপর উঠে' তাদের গায়ে বর্শা ছুড়ে মার্‌তে লাগ্‌ল। হাতী দুটোর চেহারা তখন হয়ে উঠ্‌ল দুটো প্রকাণ্ড সজারুর মত। দুটোতে ডালপালা ও মাঝারি গোছের গাছ ভেঙে, মোটা মোটা লতার জাল সুতোর মত ছিঁড়ে ছুটতে লাগ্‌ল। যে হাতীটা বড়, সেটা হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে নিগ্রোদের সর্দ্দারকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ কর্‌লে। হাতীটা কাছে আস্‌তেই সর্দ্দার তার বুক লক্ষ্য ক'রে হাতের বর্শাখানা

ছুঁড়ে মেরেই তীরবেগে ছুটে' পালাল। আর, যে নিগ্রোগুলো তার কাছে ছিল তা'রা যে যেদিকে পার্‌লে ছুট্‌ দিলে। হাতীটা তখন কার ওপর প্রতিশোধ নেবে ঠিক করতে



হাতীটা তাড়া কর্‌লে

পার্‌লে না। শোভনলালরা তিনজনে তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। হাতীটা তাদেরই তাড়া কর্‌লে। তা'রাও তিনজনে ছুটে' যেতে যেতে বীরেন্দ্র একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়ে

প'ড়ে গেল। হাতীটা সেই সুযোগে তার দিকেই ছুটে' যেতে লাগ্‌ল। বন্ধু যে এমন বিপদে প'ড়েছে শোভনলাল ও রতন কিন্তু তা বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বীরেন্দ্রের চীৎকারে তা'রা ফিরে তাকিয়ে দেখে বন্ধুর প্রাণ-সংশয়! গেল, ঐ বুঝি হাতীর পায়ের তলায় তার প্রাণ গেল! দু'জনে তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরে এসে, একজন হাতীটার মগজ আর একজন হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে একসঙ্গে চারটে গুলি ছাড়্‌লে। হাতীটাও সে আঘাতে থম্‌কে দাঁড়াল; তারপর থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আধ হাত মোটা গোটা তিনেক গাছের ওপর হুড়মুড় ক'রে লুটিয়ে পড়্‌ল। গাছগুলোর অবস্থা তখন প্যাঁকাটির (পাট-কাঠি) মত—মট্‌-মট্‌ ক'রে ভেঙে গেল।

এদিকে এই ব্যাপার শেষ হতে না হতে ওদিক্‌ থেকে নিগ্রোদের হাঁকাহাঁকি ও চীৎকার শোনা যেতে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি রাইফেলে গুলি পুরে তিনজনে সেদিক্‌ পানে ছুট্‌ল। গিয়ে দেখে, দ্বিতীয় হাতীটা একটা গাছকে ভাঙ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে তারা গাছের ওপরদিকে তাকিয়ে দেখে, তার একটি ডালে ব'সে স্বয়ং নিগ্রো-সর্দ্দার! হাতীটার আশে-পাশে আরও অনেক নিগ্রো ছিল, কিন্তু তাদের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও কর্‌ছিল না; তার

যত রাগ সর্দ্দারের ওপর। সর্দ্দারকে সে মেরে ফেল্‌বেই। গাছটাও তেমন মোটা নয়—হাতীটার গুঁতোর চোটে দুলে দুলে উঠ্‌ছে। সর্দ্দারের তখন যা অবস্থা! বেচারা বহু কষ্টে একটা ডাল আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছে। হাতীটারও পিঠ ও পাঁজরায় বর্শার পর বর্শা বিঁধছে। তার সেদিকে তিল-মাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে গাছটাকে ক্রমাগত ধাক্কা মারছে। গাছটাও তার প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্রমে নুয়ে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। সর্দ্দার যে কোন্ সময় হাত ফস্‌কে নীচে পড়ে, ঠিক নেই। বীরেন্দ্র হাতীর মগজ লক্ষ্য ক'রে একসঙ্গে যোড়া-গুলি ছুড়্‌লে। গুলি ছুটো



ডালে ব'সে স্বয়ং নিগ্রো-সর্দ্দার

হাতীটার মগজে বিঁধে গেল। হাতীটা শুঁড় পাকিয়ে গাছের গোড়ায় একটু একটু ক'রে ব'সে একটা বড় গোছের নিঃশ্বাস ফেলে' চোখ দুটো বন্ধ করলে।

নিগ্রোগুলোর তখন কি স্ফূর্ত্তি! নিমেষের মধ্যে তা'রা অত বড় দুটো হাতীকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে, কেটে-কুটে ভোজের যোগাড় করলে। তিন বন্ধুর ভাগে পড়ল চারটি বড় বড় দাঁত আর একখানি পা। সর্দ্দারের হুকুমমত জনকয়েক নিগ্রো সেগুলো কাঁধে ক'রে শিকারীদের আস্তানায় পৌঁছে দিতে চলল।

ইতিমধ্যে সেখানেও আবার এক বিপদ্ উপস্থিত।

চার

বেলা তখন প্রায় শেষ ; সবুজ বনের মাথায় সোনার দাগের মত একটু রোদ লেগে আছে। তা'রা আস্তানায় পৌঁছ্‌ল।

পৌঁছে দেখে—মঙ্গরু, ভেম্বা বা বলদগুলো কেউ সেখানে নেই। কেবল গাড়ীখানা মুখ থুব্‌ড়ে পুচ্ছ তুলে গাছের তলায় প'ড়ে আছে। শোভনলালরা মনে কর্‌লে, তা'রা জল খেয়ে ফেরে নি। কিন্তু চারদিকে মাটি ও ছোট ছোট জঙ্গলের ওপর চোখ পড়্‌তে দেখে, পাতার গায়ে, ডালে ডালে রক্ত—তখনও বেশ তাজা রয়েছে। কয়েক জায়গার মাটি খোঁড়া, জঙ্গলের ছোট ছোট ডালগুলো ভাঙা ও নোয়ানো। ব্যাপার কি ?

হঠাৎ তাদের মাথার ওপর সর্‌-সর্‌ ক'রে গাছের কয়েকটা ডাল একটু ন'ড়ে উঠ্‌ল, আর সেই সঙ্গে কে যেন খুব চাপা গলায় ডাক্‌লে—"হুজুর !"

ডাক শুনে তা'রা ওপরদিকে তাকিয়ে দেখে, ডালের ওপর মঙ্গরু ব'সে। তার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে ইসারা কর্‌লে—"চুপ্‌ !"

তারপর ডানদিকে হাত বাড়িয়ে তেমনি চাপা গলায় বল্লে —"শিম্বা" অর্থাৎ সিংহ।

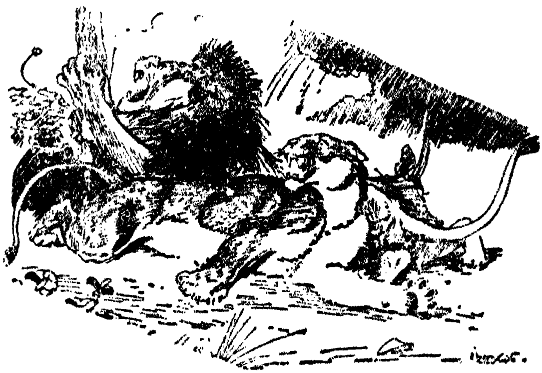
শোভনলাল তৎক্ষণাৎ গাছে চ'ড়ে দেখে, বেশী দূরে নয় —দুটো প্রকাণ্ড সিংহ ও সিংহী তাদেরই একটা বলদের মাংস খাচ্ছে। ব্যাপার দেখে রাগে তার সারা শরীর



সিংহ ও সিংহী বলদের মাংস খাচ্ছে

কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। সে ইসারায় বীরেন্দ্র ও রতনকে গাছে চড়্‌তে বল্লে। নিগ্রোগুলো এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বীরেন্দ্র ও রতনকে গাছে উঠ্‌তে দেখে ব্যাপারটা চট্ ক'রে বুঝে নিয়ে, হাতীর পা ও দাঁত চারটে সেখানে ফেলে তা'রা নিঃশব্দে স'রে পড়্‌ল।

সিংহ দুটো বোধ হয়, তাদের গায়ের গন্ধ ও চলাফেরার শব্দ পেয়ে থাক্‌বে। হঠাৎ তা'রা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। দুটোতেই শিকারীদের আস্তানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আর যায় কোথা! অমনি তিনটি রাইফেলের গুলি গিয়ে তাদের সেখানে শুইয়ে ফেল্‌লে। সিংহীটা আর উঠ্‌ল না। সিংহটা প'ড়েই বিকট গর্জ্জন ক'রে আবার উঠে'



শুক্‌নো ডাল কাম্‌ড়ে…

দাঁড়াল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প'ড়ে গেল। গুলির আঘাতে তার মেরুদণ্ডটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তখন রাগে-যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ কর্‌তে কর্‌তে তার পাশে যে মোটা ও শুক্‌নো ডাল প'ড়ে ছিল, সেটাকে কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে খড়কে কাঠির মত ক'রে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। তার এমন দুর্দ্দশায়ও শোভনলালের রাগ

পড়ে নি। সে আবার একটা গুলি করলে। এবার সিংহটার সব যন্ত্রণার শেষ হ'ল। মঙ্গরুও অমনি সড়াক্ ক'রে গাছ থেকে নেমে মরা সিংহ দুটোর পিঠে দু'ঘা ডাণ্ডা কশিয়ে দিলে।

ডেম্বা এতক্ষণে একটা বেলগাছের ওপর ব'সে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছিল। সিংহ দুটো মারা পড়্‌তে সে অতিকষ্টে নীচে নেমে এল। শোভনলালরা তখন নীচে নেমে এসে সিংহটার পাশে দাঁড়িয়েছে; ডেম্বাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"কখন এ কাণ্ড ঘটেছে?"

সে বল্লে—"হুজুর, দুপুরবেলা ক্রোশখানেক দূরে ডোবা থেকে বলদগুলোকে জল খাইয়ে ফের্‌বার পথে, সিংহটা আমাদের পিছু নেয়। তখন বহুকষ্টে বেঁচে এসেছি। এখানে পৌঁছে বলদগুলোকে বাঁধ্‌তে না বাঁধ্‌তে সিংহটা সব চেয়ে বড় বলদটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে; কিন্তু একা কিছুতেই তাকে কাবু করতে পারে না। অমনি কোথা থেকে সিংহীটা এসে ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে বলদটাকে শেষ ক'রে ফেলে। সেই লড়াইয়ের সময় বাকী বলদগুলো ছুটে' পালায়, আর আমরা দু'জনে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাই।"

শোভনলাল বল্লে—"এখন উপায়? সে বলদগুলোকে কোথায় পাবি?"

—"সে ভাবনা নেই হুজুর! মঙ্গরু আর আমি এখনই তাদের খুঁজে আন্‌ছি।"

মঙ্গরু বল্লে—"হাঁ হুজুর, তা'রা কাছেই কোথাও আছে।"

—"তবে এখনই যা।"

মঙ্গরু ও ডেম্বা তৎক্ষণাৎ বলদের খোঁজে রওনা হ'ল। তা'রা চ'লে যেতে—তিনবন্ধু মিলে সিংহটার ছাল ছাড়াতে লেগে গেল।

এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে—মঙ্গরু আর ডেম্বা তবু ফেরে না। তারপর সন্ধ্যা উত্‌রে রাত হ'ল, তা'রা আগুন জ্বালিয়ে বস্‌ল। তবু তাদের দেখা নেই। মাঝে মাঝে তা'রা বন্দুকের আওয়াজ করে; কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। তখন তিনজনের বিষম ভাবনা হ'ল, বলদগুলো যদি না পাওয়া যায়, মঙ্গরুরা যদি না আসে, তা হলে কি কর্ত্তব্য—আর তাই নিয়ে তিনবন্ধুতে অনেক রাত অবধি পরামর্শ চল্‌ল। শেষে তা'রা ঠিক কর্‌লে—তাদের সকলকে না পাওয়া গেলেও তা'রা হেঁটেই গরীলার সন্ধানে যাবে। গরীলা শিকার না ক'রে বাড়ী ফির্‌বে না।

পরদিন একটু বেলায় তা'রা যখন রওনা হবার যোগাড় কর্‌ছে, তখন মঙ্গরু আর ডেম্বা ছ'টা বলদ হাঁকিয়ে সেখানে

এসে হাজির। একটা কোথায় হারিয়ে গেছে। রাতে



আগুন জ্বালিয়ে বস্‌ল

আসে নি কেন, জিজ্ঞাসা করায় বল্লে,—কাল ফের্‌বার সময়

মাঝপথে রাত হয়ে গেল ব'লে, তা'রা আস্তানায় পৌঁছুতে পারে নি ; একটা গাছের তলায় আগুন জ্বেলে রাত কাটিয়েছিল। হাতীর পা-খানা তখন সেখানে প'ড়ে ছিল। মঙ্গরুরা সারারাত কিছু খায় নি। তু'জনে ক্ষিধের জ্বালায় সেই কাঁচা পা-খানাকেই খেতে লাগ্‌ল। তারপর খাওয়া শেষ ক'রে তা'রা আবার চলা সুরু করলে।

এ বনটা বড় না হলেও খুব ছোট নয়। মাঝে মাঝে গাছগুলো এমন গায়ে গায়ে আর লতায় লতায় জট পাকানো যে, তার মধ্য দিয়ে গাড়ী চলে না। তা'রা গাড়ী থেকে নেমে কুড়ুল দিয়ে ডালপালা, ছোট ছোট গাছ ও লতার জোট কেটে গাড়ী চল্‌বার পথ ক'রে নেয়, আর একটু একটু ক'রে চলে। এমনি ক'রে চ'লে বন পেরিয়ে, তারা গিয়ে পড়্‌ল একটা বিশাল মাঠের কিনারে।

সে মাঠের শেষ প্রায় দেখা যায় না। তার ওপর হাতখানেক ক'রে লম্বা ঘাস—ঘাসবনের ওপর ঢেউ তুলে বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় যেন ধানের ক্ষেত। সেই মাঠে অনেক দূরে একপাল হরিণ ও জেব্রা মনের সুখে চ'রে বেড়াচ্ছিল। একদিকে গোটা কয়েক বুনো গাধাকেও দেখা গেল ; কিন্তু সময় ও সুবিধা না থাকায় শিকার করা হ'ল না। মঙ্গরুর নির্দ্দেশমত মাঠটা কোণাকুণি

পার হয়ে তা'রা সেই দিনই সন্ধ্যায় ভেয়াল নদীর তীরে পৌঁছল।

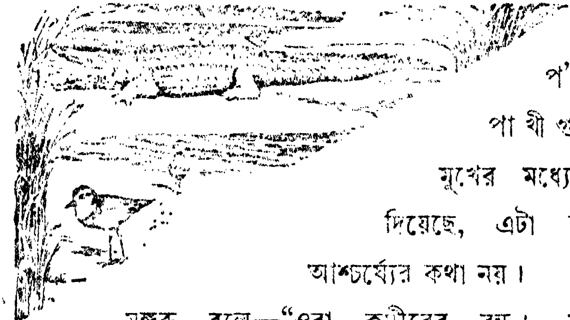
নদীটা তাদের পার হয়ে যেতে হবে।

ছোট নদী; জলও বেশী নেই। দুই তীরে খুব ঘন ঝোপ-ঝাড় ও বড় বড় গাছের মেলা। ক'দিন বৃষ্টি হয় নি। দুপুর থেকে আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছিল। সন্ধ্যায় সে মেঘ গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুঙ্কার দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি ছুটে' এল। ঘন ঘন মেঘ ডাক্‌তে লাগ্‌ল, বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগ্‌ল। নদীপারে একটা তালগাছের মাথায় কড়কড়িয়ে বাজ পড়্‌ল। তা'রা একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। তাদের দুর্দ্দশারও একশেষ। সকলে ক্ষিদেয় অস্থির। আগুন জ্বাল্‌বারও উপায় নেই। এমনি রাতে আবার পশুরাজের বিক্রম বেড়ে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ তাদের ত্রিসীমানাতেও কোন সিংহ ঘেঁস্‌ল না—দূর থেকেই হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে চ'লে যেতে লাগ্‌ল।

তারপর বৃষ্টি যখন থাম্‌ল, রাত তখন অনেক। কাজেই কেবল ক'দিনের বাসী পাঁউরুটি ছাড়া কপালে আর কিছু জুটল না। শুধু তাই নয়, জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে সকলকে রাতখানা জেগেই কাটাতে হ'ল। আশা ছিল পরদিন নদীটা পার হতে পার্‌বে।

কিন্তু ভোর হতেই দেখে নদীর জল ফেঁপে উঠেছে। অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আর পার হওয়া যাবে না। অগত্যা তা'রা নদীর তীর ধ'রে গাড়ী চালিয়ে দিলে। তীরে গাছে গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে কত রকমের পাখী। তার মধ্যে এক রকম পাখী ছিল বড় মজার। তা'রা ফণা তুলে নদীর জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে! পাখীগুলো দেখে তাদের প্রথমে মনে হ'ল সাপ। ভাল ক'রে নজর ক'রে দেখে, ওগুলোর নীচের দিকটা সাপের মত বটে, কিন্তু তা'রা আসলে পাখী! একটা পাখীকে গুলি করতে সেটা সেই যে ডুব দিলে, আর উঠ্‌লই না। তারপর আরও কিছুদূর গিয়ে শুনতে পেলে ঝোপের মধ্য থেকে হাতুড়ী ঠোকার শব্দ হচ্ছে। তেমন জায়গায় আবার কামারশাল কি ক'রে আসবে? ঠিক করতে না পেরে রতন গাড়ী থেকে নাম্‌বার উপক্রম করতেই মঙ্গরু বল্লে—"ওটা পাখীর ডাক। ঐ দেখুন—"

তা'রা দেখ্‌লে, নদীর মাঝে ছোট একটি চর। তার ওপর গোটা কয়েক কুমীর হাঁ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে আছে। আর, তাদের মুখের মধ্যে গোটা পাঁচ-ছয় পাখী নিশ্চিন্তমনে ব'সে কুমীরগুলোর দাঁত থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। কুমীরের মত রাক্ষুসে জানোয়ার এমন শান্ত-শিষ্টের



মত প'ড়ে থেকে পাখীগুলোকে মুখের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছে, এটা বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

মঙ্গরু বল্লে—"ওরা কুমীরের বন্ধু। কুমীরদের দাঁতে যে পোকা লাগে, তার কামড়ে বড় যন্ত্রণা হয়। ওরা সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। তাই কুমীরেরা ওদের কিছু করে না।"

এ ধরণের পাখী কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও আছে। যে নদীতে কুমীর থাকে, তার তীরেই এদের বাস।

মঙ্গরুর কথা শেষ হতে না হতে শোভনলাল একটা কুমীরের চোখ লক্ষ্য ক'রে গুলি কর্‌লে। ব্যস্‌—অমনি ঝপ্‌-ঝপ্‌ ক'রে কুমীরগুলো জলে নেমে ডুব দিলে। পাখীগুলো চারদিকে উড়্‌তে উড়্‌তে হাতুড়ী পিট্‌তে লাগ্‌ল, আর চড়ার কাছে খানিকটা জল কিছুক্ষণ রক্তে লাল হয়ে রইল।

এদিকে সকলেই ক্ষিধেয় অস্থির। এক পাঁউরুটি ছাড়া সঙ্গে আর কিছু খাবারও নেই। মাঝে মাঝে হরিণের দেখা পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু তা নিমেষের জন্য। এক

জায়গায় দেখ্‌লে, একঝাঁক জলমুরগী কলরব ভুলে নদীর জলে খেলা কর্‌ছে। তিনজনের গুলিতে তাদের গোটা আষ্টেক মারা পড়্‌ল; কিন্তু দুটোকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই ছ'টিকেই ছাড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে পাঁচজনে মিলে খুব তৃপ্তির সহিত খেতে লাগ্‌ল। বেলা তখন দুপুর।

এদিকে নদীর জলও ক'মে এসেছে। একটা জায়গায় নদীটা এত সরু যে, বিশ-পঁচিশ হাতের বেশী হবে না। তা'রা সেই জায়গায় পার হ'য়ে বনের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে সন্ধ্যার দিকে বেচুয়ানা-নিগ্রোদের দেশের সীমান্তে পৌঁছ্‌ল।

বেচুয়ানারা দূর থেকে তাদের দেখ্‌তে পেয়ে প্রথমে শত্রু ভেবে হৈ-হৈ শব্দে তাদের আক্রমণ কর্‌লে। মঙ্গরু ও ডেম্বা তাদের কাছে পরিচয় দিতেই তা'রা সকলকে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

সে রাজার চেহারা ও রাজবাড়ীর কথা আর কি বল্‌ব? রাজার সারা গায়ে উল্কি, গলায় হাড়ের মালা, মাথায় একটা টুপী— যেন ধুচনী! রাজবাড়ীটা একটা



কুঁড়েঘর—পাতার চাল, মাটির দেওয়াল; কিন্তু তা' হলে কি হয়? রাজা তো—তাই তাঁর রাণীও তিন তিনটে! তাঁদের চেহারাও রাজার মত।

বিদেশী এসেছে শুনে, রাণীরাও বেরিয়ে এলেন দেখ্‌তে। তিনবন্ধু রাজা-রাণীকে অভিবাদন ক'রে বল্লে—"আমরা শিকারী, গরীলা শিকার করতে বেরিয়েছি।" তারপর মঙ্গরুকে গাড়ী থেকে কাঠের বাক্সটা আন্‌তে বল্লে।

রাজা-রাণী তো শিকারীদের কথা শুনে হেসেই সারা! তাঁরা বল্লেন—"তোমরা তো এইটুকু ছেলে—আবার শিকার করবে কি?"

তা'রা জবাব দিলে—"মহারাজ, কাল পরীক্ষা দেব।"

ইতিমধ্যে মঙ্গরু কাঠের বাক্সটা এনে রাজার সম্মুখে রাখ্‌লে। তিনবন্ধু বাক্সের ডালা খুল্‌তেই কাচের মালাগুলো দীপের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠ্‌ল। রাণীরা তার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রাজাও অবাক্‌। রাণীরা আস্তে আস্তে স'রে এসে বাক্সটার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনবন্ধুতে তার মধ্য থেকে তিনখানা রঙিন কাপড়, পিতল-তামার বালা ও চুড়ি, আর কতকগুলো মালা নিয়ে রাণীদের উপহার দিলে। রাণীরা তো মহাখুশী। তাঁদের ইচ্ছা যে সমস্ত জিনিসগুলোই তাঁরা নেন। রাণীদের



"মহারাজ! কাল পরীক্ষা দেব"

ইচ্ছা!—কাজেই শিকারীরা আপত্তি করতে পারলে না। লোকজন এসে বাক্সটা অন্তঃপুরে নিয়ে গেল।

তখন তাদের কি আদর! কালাবাসে (কুমড়োর খোলে) ক'রে দুধ, গোটা কয়েক মুরগী প্রভৃতি নানা রকম খাদ্য-অখাদ্য এসে হাজির। রাজা তিনবন্ধুকে বড় বড় তিনটে হাতীর দাঁত উপহার দিলেন; আর বল্লেন—"শিকার করতে হয়, তোমরা আমার রাজত্বে যতদিন খুশী শিকার কর; আমার রাজত্বের উত্তরে যে নিগ্রোদের বাস, তা'রা ভয়ঙ্কর লোক। ওদিকে গেলে তোমাদের হয়ত মেরে ফেলবে।"

শিকারীরা তখনকার মত সে কথায় সম্মতি জানালে। কিন্তু পরদিন ভোর হতেই রাজার কাছে নিজেদের ইচ্ছা জানিয়ে বিদায় চাইলে। রাজা প্রথমে কিছুতেই অনুমতি দেবেন না। ছেলে তিনটির মুখ দেখে রাণীদেরও স্নেহ জন্মেছিল। তাঁরা তাদের ধ'রে রাখবার বহু চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাদের একান্ত আগ্রহে শেষে অনিচ্ছার সঙ্গে অনুমতি দিয়ে, যাবার সময় বল্লেন—"আবার এসো, বাছারা!"

তা'রা সম্মতি জানিয়ে সকলকে অভিবাদন ক'রে রওনা হ'ল। সঙ্গে চল্‌ল রাজা-রাণীর আজ্ঞায় বিশজন নিগ্রো অনুচর।

নিগ্রো অনুচরেরা হৈ-হৈ করতে করতে তাদের আগে ও

পরে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে মাঝে মাঝে হরিণ, বুনো কুকুর, শূয়োর, ক্ষুদে হরিণ (খরগোসের চেয়ে আকারে বড়), দু'-চারটে বুনো গাধাও শিকারীদের সাম্‌নে পড়্‌ল। কিন্তু সেগুলোকে শিকারের কোন সুযোগ হ'ল না। এক জায়গায় দেখ্‌লে, একটা প্রকাণ্ড বুনো মহিষ প'ড়ে আছে; তার শরীরের কোন কোন অংশ—বিশেষ ক'রে পিছন দিক্‌টা খাওয়া। বোধ করি, কিছু পূর্ব্বে সিংহমশায় দেহটাকে নিয়ে ফলারে বসেছিলেন; তাদের গোলমালে বনের মধ্যে কোথায় যেন গা-ঢাকা দিয়েছেন। বন ঠেঙ্গিয়ে তাকে বা'র করা সম্ভব হলেও সময় নষ্ট হবার ভয়ে তা'রা এগিয়েই চল্‌ল।

পাঁচ

বেচুয়ানা রাজ্যের সবটাই গভীর বনে ঢাকা। পথে তা'রা সঙ্গী নিগ্রোদের জন্য একটা হাতী ও নিজেদের জন্য গোটা ছুই হরিণ শিকার কর্‌লে। এ রাজ্যটা পার হতে তাদের ছু'দিন লাগ্‌ল।

রাজ্য-সীমান্তে লিম্পোপো নদী—দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছুটি তীরে সবুজ সতেজ বৃক্ষ-লতা, তাতে নানা রকম ফুল ফুটে আছে। কোন কোন গাছের পাতা ও ছালের গন্ধে বাতাস ভরপূর। সীমান্তে পৌঁছেই অনুচরগণ ফিরে গেল। কিন্তু এবার আর শিকারীদের নদী পার হতে হ'ল না। নদীটাকে ডাইনে রেখে তা'রা বরাবর তীর ধঁরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় দেখ্‌লে গোটা তিনেক জলহাতী নদীর জলে খেলা কর্‌ছে। একটা ছোট; আর ছুটো প্রকাণ্ড, বোধ হয় তার মা-বাপ। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। তা'রা শিকারীদের গলার আওয়াজ শুনেই ডুব দিলে। আর একটু দূরে আরও ছুটো দেখা গেল—তা'রা

তীরের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে কচি কচি পাতা খাচ্ছে। শিকারীরা তাদের দেখা মাত্র গাছের আড়ালে গাড়ী থামিয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়্‌ল। কিন্তু জলহাতী দুটোর খেয়াল ছিল না যে, তাদের কাছ থেকে কিছুদূরে একদল শিকারী ঝোপের আড়াল থেকে তাদের লক্ষ্য ক'রে বন্দুক তুলেছে। যখন শিকারীদের উপস্থিতি জানতে পার্‌লে, তখন আর পালাবার উপায় ছিল না। অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকারীরা তাদের দুটোকে গুলি কর্‌লে। গুলি খেয়ে একটা জলে নেমে স্রোতের সঙ্গে সোজা ভেসে চল্‌ল। আর একটা সেইখানেই হুড়্‌মুড়্‌ শব্দে কাৎ হয়ে পড়্‌ল। সেদিকে একদল নিগ্রো বর্শা হাতে শিকারে বেরিয়েছিল। তা'রা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখ্‌ছিল ব্যাপারটা কি ঘটে। জলহাতীটা মারা পড়তে সকলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল।

বেচুয়ানাদের সঙ্গে এই সব নিগ্রোদের সদ্ভাব নেই। সুবিধা পেলেই তা'রা পরস্পরের গাঁ লুঠ করে। দু'দলের মধ্যে মারপিট লেগেই আছে। যে সব লোক বেচুয়ানাদের দেশ থেকে আসে, তাদের এরা ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু জলহাতীটার মাংস দিয়ে তাদের সঙ্গে শোভনলালদের মিতালী কর্‌বার সুযোগ হয়ে গেল। নিগ্রোরা মহাস্ফূর্ত্তিতে জলহাতীটাকে ওপরে একটা ফাঁকা জায়গায় টেনে এনে,

তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য সুরু ক'রে দিলে। মঙ্গরু আর ডেম্বাও একলাফে গাড়ী থেকে নেমে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চীৎকার ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সকলে মিলে জলহাতীটার দেহ নিয়ে টানাটানি কাড়াকাড়ি সুরু ক'রে দিল। ছুটো নিগ্রো আবার তার পেটের ভেতর ঢুকে নাড়ী-ভুঁড়ি টেনে টেনে ছিঁড়্‌তে লাগ্‌ল। তাদের কাণ্ড দেখে মনে হতে লাগ্‌ল, যেন রাক্ষসের মেলা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত বড় দেহটা সাবাড় হয়ে গেল—বাকী রইল কেবল হাড় ক'খানা। তারপর চারদিকে আগুন জ্বেলে সেই আগুনে মাংস পুড়িয়ে তা'রা তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

সে-দিন শিকারীরা আর সেখান থেকে এগোতে পারল না। রাতখানা তাদের সেখানেই কাটাতে হ'ল।

পরদিন লিম্পোপো নদী ছাড়িয়ে তা'রা ঙ্গামী হ্রদের দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল। লিম্পোপো ও ঙ্গামী হ্রদের মাঝে কালাহারী মরুভূমির একভাগ পড়ে। মরুভূমিতে যেতে হলে প্রথমে একখানা বিশাল মাঠ পার হয়ে যেতে হয়। সে মাঠে গাছ-পালা তেমন নেই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড় ও গর্ত্ত। তা'রা সেই মাঠ পাড়ি দিয়ে চল্‌ল।

কিছুদূর চলার পর হঠাৎ দেখ্‌লে—মাইলখানেক দূরে—

গোটা কয়েক উটপাখী চ'রে বেড়াচ্ছে। পাখীগুলোও তাদের দেখ্‌তে পেয়েছিল। কিন্তু অন্য দিকে না পালিয়ে তা'রা শিকারীদের দিকেই ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। শিকারীরা তো অবাক্!

মঙ্গরু বল্লে—"পাখীগুলো বড় বোকা। শত্রুকে দেখ্‌লে পিছন ফিরে উল্টো দিকে পালায় না, তার সাম্‌নে দিয়েই ছুটে পালায়। সেই সময়ই ওদের শিকার করার সুযোগ।"

মঙ্গরুর কথা শুনে তিনবন্ধু গাড়ী থেকে তৎক্ষণাৎ নেমে পড়্‌ল। কিন্তু পাখীগুলোর জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। মাত্র মিনিট ত্বয়েকের মধ্যেই পাখীগুলো তাদের সাম্‌নে—হাত পঁচিশ দূরে এসে পড়্‌ল। শিকারীরাও প্রস্তুত ছিল; অমনি তিনটি পাখীকে লক্ষ্য ক'রে তিনজনে গুলি ছুড়্‌ল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! উটপাখীর দল ধূলো উড়িয়ে তাদের সমুখ দিয়ে পালিয়ে গেল। যে পাখী ঘণ্টায় তিরিশ মাইলেরও বেশী দৌড়ায়, তাকে গুলি করা কি সহজ? তবে রতনের ভাগ্য ভাল। তার গুলিটা পাখীর গায়ে লাগ্‌ল; পাখীটা প'ড়েও গেল। রতন তীরবেগে ছুটে' গিয়ে তার লম্বা গলাটা চেপে ধর্‌লে। অমনি এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘট্‌ল। সকলে দেখ্‌লে রতন মাটিতে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে; আর, পাখীটা উঠে ছুটে' পালাচ্ছে!

বীরেন্দ্র ও শোভন ছুটে' গিয়ে দেখে বেচারার অবস্থা সঙ্গীন। উটপাখীটার একটি লাথিতে তার গলার ডানদিকের হাড়খানি স'রে গেছে। শোভন তৎক্ষণাৎ হাড়টাকে ঠিক



রতন···লম্বা গলাটা চেপে ধর্‌লে

জায়গায় বসিয়ে দিলে। ওদিকে পাখীটারও অবস্থা কিন্তু তখন কাহিল। মাত্র হাত তিরিশেক দূরে গিয়েই সে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল। তার দেহে তখনও একটু প্রাণ ছিল।

হয়ত কিছুক্ষণ বেঁচেও থাক্‌ত; কিন্তু মঙ্গরু ছুটে' গিয়ে ডাণ্ডা পেটা ক'রে তার দফা শেষ ক'রে দিলে, তারপর রতনের পাশে সেটাকে টেনে এনে ফেল্‌লে। মরা উটপাখীটাকে দেখে রতনের ব্যথা যেন অর্দ্ধেক ক'মে গেল; কিন্তু বাকী অর্দ্ধেকটা সার্‌তে আরও দুটো দিন লেগেছিল।

হাঁস-মুরগীর ডিমের মত উটপাখীর ডিমও সুস্বাদু, কিন্তু সংগ্রহ করা বড় কঠিন। পাখীগুলো এমন হিংসুটে যে শত্রুর ভয়ে পালাবার আগে নিজের ডিম নিজেই পা দিয়ে ভেঙে ফেলে, যাতে কেউ না নিতে পারে। উটপাখীর পালকের মত ডিমের খোলারও বড় আদর। নিগ্রোরা তার মধ্যে জল ও দুধ রাখে, আরবীরা তার মধ্যে আলো জ্বালিয়ে চীনা লণ্ঠনের মত ঝুলিয়ে দেয়!

মঙ্গরু তো অনেক চেষ্টার পর একটা ডিম যোগাড় ক'রে আন্‌লে। সেটার ওজন প্রায় দু'সের হবে। সেটিকে খেলে তিনবন্ধু মিলে আর উটপাখীটাকে শেষ কর্‌লে মঙ্গরু ও ডেম্বা।

উটপাখীরা উড়্‌তে পারে কিনা এ কথাটা হয়ত জান্‌তে বড় ইচ্ছে। তাদের চেহারাটা পাখীর মত হলেও ডানা দু'খানি দেহের তুলনায় কিছুই নয়। অত ছোট ডানায় ভর ক'রে তাদের পক্ষে উড়ে যাওয়া অসম্ভব। বড় বড় ডানা থাক্‌লে, মানুষ এরোপ্লেনের বদলে বহুকাল আগে

উটপাখী পুষে তার পিঠে চ'ড়েই হয়ত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করত।

তারপর আবার চলা সুরু হ'ল। সারাদিন কেটে গেল, তবু সে মাঠের শেষ আর নেই।

মঙ্গরু বল্লে—"হুজুর, দু'-একটা হরিণ না মারলে এরপর না খেতে পেয়ে সকলে মরব।"

কিন্তু খুব দূরে দূরে দু'চারটে উটপাখী ছাড়া আর কিছু তাদের চোখে পড়ল না তো মারবে কি? সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি তা'রা মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে মরুভূমির কূলে পৌঁছল।

সে এক ভয়ানক দৃশ্য। সাম্নে ধূ ধূ করছে শুক্নো মাঠ—লাল বর্ণ! তার মাঝে কোথাও গাছপালা তো দূরের কথা, একটু ঘাসও নেই। তার ওপরকার আকাশ-খানাও শুক্নো খট্‌খটে—রংটাও যেন একটু কটা। সেই আকাশে কোনদিন মেঘও ভাসে না, কোন পাখীও ওড়ে না। সূর্য্যদেব তো দেখতে দেখতে মরুভূমির ওপারে আকাশে আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে নিঃশব্দে অস্ত গেলেন। শিকারীরাও রাতের মত সেখানে বিশ্রাম করতে লাগল।

পরদিন থেকে তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ কষ্ট সুরু

হ'ল। সঙ্গে যে জল ও মাংস ছিল, দু'দিনেই শেষ হয়ে গেল। বলদগুলোর ভাগ্যে প্রথম দিন থেকেই ঘাস-জল কিছুই জুটল না। তৃতীয় দিনে সকলের মনে হ'ল, মরুভূমিতেই বুঝি সকলকে প্রাণ হারাতে হবে। বলদগুলো আর চল্‌তে পারে না। তাদের ভার কমাবার জন্যে সকলে গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে চল্‌ল। কিন্তু তাতেও বিপদ; হেঁটে চলাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্য্য, পেটে ক্ষিধের আগুন, পায়ের নীচে তপ্ত মাটি। মাঝে মাঝে তপ্ত বালুকারাশি উড়িয়ে আকাশ অন্ধকার ক'রে সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়া ছুটে' আসে—তখন মনে হয়, এই শেষ! এ অবস্থায় কতদূর চলা যায়? একটু জল, একটু ছায়া, এক টুক্‌রো মাংসের অভাবে তা'রা হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌ল।

শোভনলাল ছিল দলপতি; সকলের চেয়ে সে বেশী কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারত। সেও কাতর হয়ে পড়্‌ল, তবু সকলকে সে আশ্বাস দিতে লাগ্‌ল—নানা রকমে।

মঙ্গরু বল্লে—"আর এক দিনের পথ, হুজুর!"

কিন্তু সে-দিনই সকলের এমন অবস্থা যে, আর একবেলাও চল্‌তে পারে না। তবু তা'রা বহু কষ্টে আস্তে আস্তে কিছুদূর চ'লে গেল। সন্ধ্যা লাগ্‌তেই শোভনলাল বল্লে—"কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে রাতে রাতেই চলা যাক্‌। তা' হলে হ্রদটার

কাছে এগিয়ে যেতে পার্‌ব। আর, দুপুরের আগেই হয়ত সেখানে পৌঁছান যাবে।”

মঙ্গরু মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলে।

কিন্তু চল্‌বার সামর্থ্য কারও নেই। তবু দলপতির কথামত কাজ হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে অন্ধকার ও নিস্তব্ধ মরুভূমির ওপর দিয়ে 'সাউদারন্ ক্রশ' নক্ষত্র কয়টিকে দেখে দিক্ ঠিক্ ক'রে, তা'রা আবার ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল এবং সারারাত চ'লে, ভোরের দিকে এক জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে পরদিন দুপুরের আগেই তা'রা ঙ্গামী হ্রদের কাছে গিয়ে পৌঁছ্‌ল।

আবার মাটিতে নানা রকম প্রাণীর পায়ের চিহ্ন, ঘন গাছপালা, সবুজ কোমল ঘাস—নীল আকাশ দিয়ে পাখী উড়্‌তে দেখা গেল। সকলের মনে তখন কি আনন্দ! বলদগুলোও ক্লান্তি ভুলে আনন্দে বনের মধ্য দিয়ে হ্রদের দিকে ছুটে' চল্‌তে লাগ্‌ল।

ছয়

প্রকাণ্ড হ্রদ। কাচের মত স্বচ্ছ তার জল—স্থির, শান্ত। হ্রদের একটা দিক্ দেখা যায় না। তিনদিকে ঘন গাছপালা ও শরবন। তার মাঝ থেকে ছোট একটি পাহাড় আকাশ পানে মাথা তুলেছে। পৌঁছেই তা'রা সকলে মনের সাধে প্রথমে একপেট জল খেয়ে নিলে, তারপর বলদগুলোকে তীরে ছেড়ে দিয়ে মহানন্দে জলে নেমে পড়্ল! ঠিক হ'ল সেদিনটা তা'রা হ্রদের ধারেই থাক্বে, আর এগোবে না।

কিন্তু জলে নেমেই সকলে একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে সেদিক্ পানে তাকিয়ে দেখে, একপাল বুনো মহিষ সারি বেঁধে শরবনের মধ্য থেকে মাথা বা'র ক'রে তাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মহিষগুলো বোধ হয় গায়ের জ্বালা জুড়োতে জলে নাম্তে এসেছিল।

বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তীরে উঠে' রাইফেল নিয়ে একটা মহিষকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়্লে; কিন্তু গুলিটা লাগ্ল তার শিঙে। অম্নি হাঁক ছেড়ে চক্ষের পলকে মহিষের পাল শরবন দুলিয়ে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হ'ল।

মহিষের পালের পরই কিছুদূরে দেখা দিল এক জোড়া গণ্ডার। একটার নাকের ওপর প্রায় দু'হাত লম্বা এক খড়্গ। গণ্ডার দুটোর গায়ের রং কটা। আকারেও এক একটা জলহাভীর মত। তা'রা ব্যাপারটা অতশত বুঝ্‌তে পারে নি। কিন্তু কাছেই যে মানুষ আছে একথা জানিয়ে দিলে তাদের পিঠের এক যোড়া চৌকীদার-পাখী। এই পাখীগুলো গণ্ডারের পরম বন্ধু। এরা গণ্ডারের পিঠের পোকা খুঁটে খায় আর মানুষ দেখ্‌লেই বিশ্রী শব্দে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ওড়ে - যেন বলে, 'বন্ধু, হুঁসিয়ার'। বন্ধুও অম্‌নি সেই ডাক শুনে বনের মধ্যে ভোঁ দৌড়! এক্ষেত্রেও তাই হ'ল।

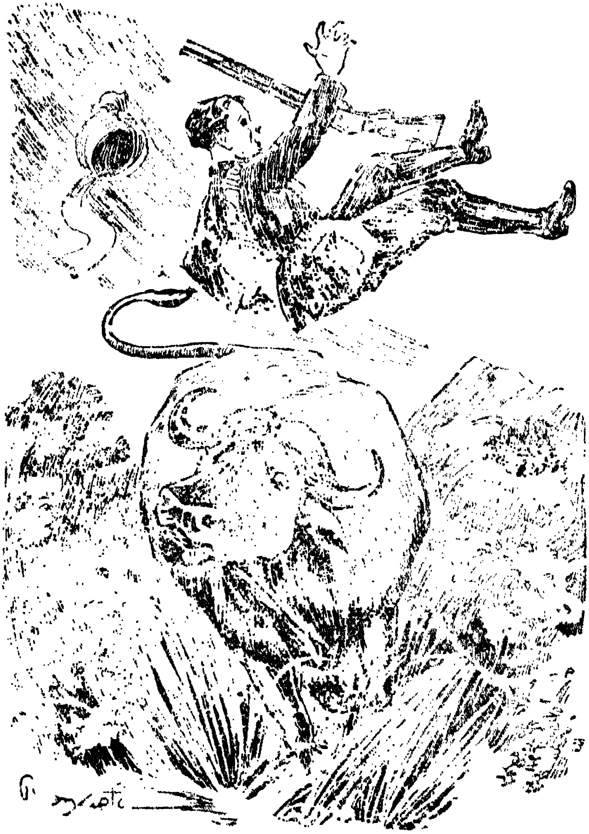
এদিকে শিকারীদের সঙ্গেও খাবার নেই। তাই তাড়াতাড়ি সকলে জল থেকে উঠে' মঙ্গরু ও ডেম্বাকে গাড়ীর জিম্মায় রেখে তিনবন্ধু শিকারে চল্‌ল। কিন্তু তিনজনে একসঙ্গে গেল না—তিন দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

ঙ্গামী হ্রদের চারধারে বন-জঙ্গল যেমন ঘন, তেমনই সেখানে পশুপাখীও আছে নানা রকম। তিনজনে তো তিন দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে নানা রকম হরিণও চোখে পড়ে, কিন্তু বন্দুক তোল্‌বার আগেই তা'রা পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে বীরেন্দ্র দেখ্‌লে একটা ছোট মাঠের শেষে তার দিকে পিছন ফিরে একটা বুনো মহিষ চ'রে বেড়াচ্ছে।

মাঠখানি বেশ বড় বড় ঘাসে ভরা। সে তৎক্ষণাৎ শুয়ে প'ড়ে বুকে ভর দিয়ে মহিষটার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। মহিষটা তখনও জান্‌তে পারে নি পিছনে তার শত্রু।

চল্‌তে চল্‌তে তার কাছ থেকে হাত কুড়ি দূরে গিয়ে পড়্‌তেই মহিষটা বোধ হয় বীরেন্দ্রের গায়ের গন্ধ পেয়ে চট্‌ ক'রে ফিরে দাঁড়াল। বীরেন্দ্রকে দেখেই তার মুখ-চোখের চেহারা হয়ে উঠ্‌ল ভীষণ। ভয়ঙ্কর হাঁক ছেড়ে লেজ তুলে, মাথা নীচু ক'রে জানোয়ারটা বীরেন্দ্রের দিকে ছুটে' আস্‌তে লাগ্‌ল। বীরেন্দ্রও প্রস্তুত ছিল। মহিষটার মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়্‌লে; কিন্তু ক্যাপে আগুন ধর্‌ল না। দ্বিতীয় ট্রিগারটা টিপ্‌তে সে ক্যাপ্‌টাও ফুট্‌ল না। তখন আর ক্যাপ্‌ বদ্‌লাবার একতিলও সময় নেই। সে উঠেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পিছনের ঝোপের দিকে দৌড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু বুনো মহিষের সঙ্গে দৌড়ে পারা সহজ নয়। মহিষটাও হাঁক ছেড়ে, লেজ তুলে তাকে তাড়া ক'রে চল্‌ল। বীরেন্দ্র ঝোপের কাছে পোঁছ্‌তে না পোঁছতেই মহিষটা তার পিছনে গিয়ে তাকে শিঙে ক'রে শূন্যে তুলে ফেলে দিলে। বীরেন্দ্র সেই ধাক্কায় সাত-আট হাত দূরে একটা ঘন ঝোপের ওপর গিয়ে পড়্‌ল। সে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আবার মহিষটা তার দিকে শিঙ্‌ নীচু ক'রে ছুটে' গেল। বীরেন্দ্র যে ছুটে'

পালাবে তারও উপায় নেই। মহিষটাও তার কাছ থেকে



শিঙে ক'রে শূন্যে তুলে ফেলে দিলে

মাত্র আর হাতখানেক দূরে, হঠাৎ বন কাঁপিয়ে রাইফেলের

শব্দ উঠ্‌ল—একসঙ্গে ঘোড়া-গুলির। মহিষটাও তৎক্ষণাৎ হুড়মুড়্‌ ক'রে ঝোপের ধারে লুটিয়ে পড়্‌ল। বীরেন্দ্র অবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে দেখে কিছুদূরে শোভনলাল।

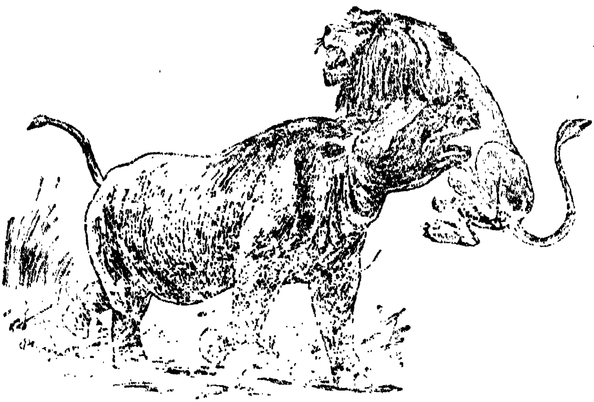
শোভনলাল বল্লে—"ভাগ্যে এদিকে এসে পড়েছিলাম।"

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হতে না হতে কিছু দূরে পাহাড়ের ধার থেকে সিংহের গর্জ্জন ও রাইফেলের শব্দ শোনা গেল। মহিষটাকে সেখানে ফেলে দুইবন্ধু তৎক্ষণাৎ সেদিক-পানে ছুটল।

কিন্তু তাদের বেশীদূর যেতে হ'ল না। সামনেই গাছ-পালা ভাঙ্গার শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা গণ্ডার একটা সিংহকে খড়্গে গেঁথে বেড়িয়ে এল। পশুরাজ খড়্গের ওপর প'ড়ে হাঁ ক'রে আছেন। তার দুর্দ্দশা দেখে সকলে তো হেসেই অস্থির। গণ্ডারটার অবস্থাও প্রায় তারই মতন সঙ্গীন। তার দুটো চোখই অন্ধ, চোখের কোটর থেকে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে রক্ত ঝর্‌ছে। সে বীভৎস দৃশ্য দেখা যায় না। গণ্ডারটা ঠিক তাদের দু'জনের দিকেই সোজা ছুটে' আস্‌তে লাগ্‌ল। তা'রা এক পাশে স'রে যেতেই দেখে গণ্ডারটার পিছনে পিছনে রতন ছুটতে ছুটতে আস্‌ছে।

সে শোভনলালদের দেখে বল্লে—"কেউ গুলি ক'রো না—

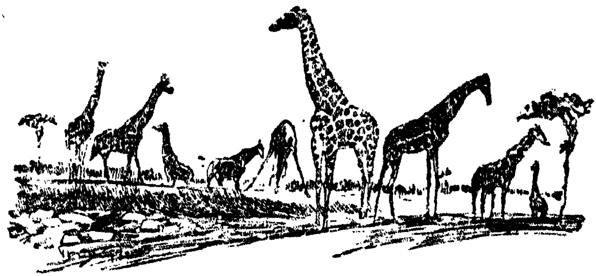
ও শিকার আমার। গণ্ডারটার একটা চোখ নষ্ট করেছে সিংহটা—বাকী চোখটা কাণা করেছি আমি।" বল্‌তে বল্‌তে সে গণ্ডারটাকে অনুসরণ ক'রে, তাদের সাম্‌নে দিয়ে ছুটে' চ'লে গেল। তার মিনিট পাঁচেক পরেই কিছু দূরে আবার রাইফেলের পর পর দুটি শব্দ হ'ল।



পশুরাজ খড়্গোর ওপর প'ড়ে হাঁ ক'রে আছেন

তা'রা দু'জনেও আর দাঁড়াল না; বনের মধ্য দিয়ে কিছু দূরে চ'লে সেই ছোট পাহাড়টার মাথায় উঠে দেখে নীচে একদল জীরাফ লম্বা লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছপালার কচি কচি ডাল ও পাতা খাচ্ছে। জীরাফদের কিছু দূর দিয়ে একদল জেব্রা লাফাতে লাফাতে ছুটে' চ'লে গেল।

তাদের পরই এল গোটা সাতেক নূ। তা'রাও বনের আড়ালে ঢাকা পড়্‌তে না পড়্‌তেই এক জোড়া সিংহ দেখা গেল। সিংহ দুটো জেব্রা ও নূগুলোকে তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে। জীরাফের দলও খুব চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সিংহ দুটো তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। তবু



একদল জীরাফ

জীরাফগুলো ভয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়টার দিকে শিকারীদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়্‌ল।

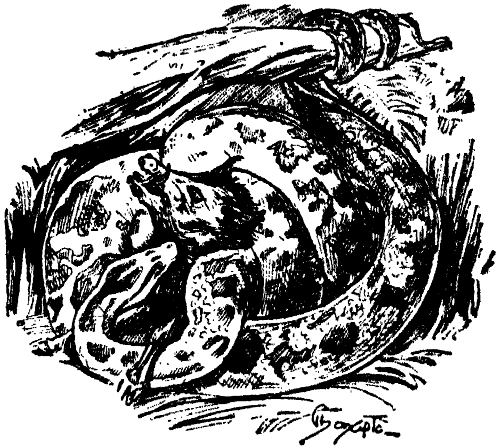
সকলের আগে যেটা ছিল, বোধ হয় সেটা দলপতি। সেটাকে লক্ষ্য ক'রে শোভনলাল গুলি ছুড়্‌লে। আচম্বিতে শত্রুর সাম্‌নে গিয়ে পড়াতে জীরাফগুলোও কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পিছনে সিংহ, সাম্‌নে মানুষ। কিন্তু সে ভাবটা রইল নিমেষের জন্য। তা'রা এবার ছুট দিলে

হ্রদের দিকে এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীরাফের পাল বনের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু দলপতির অবস্থা তখন শোচনীয়—ছোট্‌বার সামর্থ্য নেই। শোভনলালরা তার কাছে ছুটে' নেমে গিয়ে দেখে বেচারার দু'চোখ বেয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে জল পড়্‌ছে। ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ ক'রে ঘন ঘন সে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। মানুষ অসহায় অবস্থায় প'ড়ে যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—তার অবস্থাও ঠিক তেমনই। দু'বন্ধুর মনে বড় দয়া হ'ল। আর একটা গুলি মেরে জীরাফটার সব যন্ত্রণা শেষ ক'রে দিয়ে তা'রা প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, নিতান্ত দরকার না হলে আর কখনও জীরাফ, জেব্রা বা হরিণ শিকার কর্‌বে না।

ওদিকে বেলাও আর বেশী নেই। জীরাফের লেজটা কেটে নিয়ে দু'জনে পাহাড়টা পার হয়ে নাম্‌বার সময় শুন্‌তে পেল, একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়াল থেকে কাতর শব্দ উঠ্‌ছে। ব্যাপার কি? ঝোপ-জঙ্গল সরাতে সরাতে সেদিকে গিয়ে দেখে, একটা অজগর একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল শূয়োরকে কয়েক পাক জড়িয়ে ধ'রে প্যাঁচ কষ্‌ছে। সেই দারুণ চাপে শূয়োরটার ক্ষুদে চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে, জিভ্‌টা ঝুলে পড়েছে, দু'কশ বেয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে রক্ত ঝর্‌ছে—আর বেচারী দাঁত বা'র ক'রে

কাত্‌রাচ্ছে। তা'রা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই শূয়োরটার প্রাণ বেরিয়ে গেল। কিন্তু শূয়োরটা সাপের ভোগে এল না, শোভনলালের একটা গুলিতে সাপটার মাথার খানিকটা



অজগর শূয়োরকে জড়িয়ে ধ'রে প্যাঁচ কষ্‌ছে

উড়ে গেল। সাপের চামড়ায় জুতো হয় বড় চমৎকার। দুইবন্ধু সাপটার রঙ্‌বাহার চামড়াখানা ছাড়াতে লেগে গেল।

তারপর দু'জনে যখন আস্তানায় ফির্‌ল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাদের একটু আগে রতনও এসেছিল। মঙ্গরু আগে থেকেই শুক্‌নো ডালপালা যোগাড় ক'রে রেখেছিল; সকলে একত্র হতেই সেগুলো দুটি জায়গায় জড় ক'রে

আগুন ধরিয়ে দিলে। সকলেরই পেট তখন ক্ষিধেয় জ্বল্‌ছে। সেই আগুনে গণ্ডারের মাংস পুড়িয়ে তা'রা মহানন্দে খেতে সুরু করলে।

কিন্তু সে রাতে কারও চোখে আর ঘুম এল না। জেব্রা, জীরাফ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ, হাতী পর্য্যন্ত সারারাত ধ'রে হ্রদের ধারে জলপানের আশায় ঘোরাঘুরি করতে লাগ্‌ল। তাদের পায়ের শব্দে, চীৎকারে, গর্জ্জনে নিশ্চিন্তমনে শিকারীদের দু'দণ্ড ব'সে থাকা হয়ে উঠ্‌ল না। প্রাণীগুলো তৃষ্ণা নিয়ে জলের ধারে আসে; কিন্তু আগুন দেখেই ফিরে যায়। চল্‌তে চল্‌তে চীৎকার ক'রে ওঠে, যেন বলে—"ভাই সকল, সাবধান! মানুষ এসেছে।"

সাত

পরদিন রোদ উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই তা'রা রওনা হ'ল।

বনের মধ্য দিয়েই পথ। কিছুদূর গিয়েই দেখে সাম্‌নে একটা মোটা কাঠ প'ড়ে আছে। তার ওপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শোভনলাল গাড়ী থেকে নেমে কাঠখানাকে সরাতে গিয়ে দেখে, সেটা কাঠ নয়—এক অজগর সাপ। সাপটা একটা আস্ত হরিণ গিলে অসাড়ের মত প'ড়ে আছে। হরিণের দেহটা সাপটার পেটের মধ্যে গেলেও শিঙ্‌ যোড়া বেরিয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন শিঙওয়ালা সাপ!

মঙ্গরু বল্লে—"হুজুর, কিছু কর্‌বেন না, আমি যাচ্ছি।" ব'লে সে একখানা বর্শা নিয়ে গিয়ে সাপটার মাথার ওপর রেখে, খোঁটা পোঁতার মত ক'রে বর্শাখানাকে ঠুকে ঠুকে মাটিতে বসিয়ে দিলে।

সাপটা যন্ত্রণায় কুণ্ডলী পাকিয়ে লেজ আছ্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তার লেজের প্রচণ্ড আঘাতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি মোটা গাছগুলো

মট্‌মট্‌ ক'রে ভেঙে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু সাপটার কষ্ট দেখে মঙ্গরুর ত খুব স্ফূর্ত্তি! তারপর কুড়ুল দিয়ে সে সাপটাকে পাঁচ-ছয় ভাগে কেটে ফেল্‌লে। অমনি ডেম্বাও গাড়ী থেকে তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে নেমে—একটুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়ে তার রক্ত চুষে খেতে লাগ্‌ল। মঙ্গরুও বাদ গেল না। তারপর



খোঁটা পোতার মত ক'রে···

হু'জনে সাপটার হুটো টুক্‌রো সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল; বল্লে—"ওবেলা পুড়িয়ে খাব।"

চল্‌তে চল্‌তে সেখান থেকে আধ-মাইল দূরে একটা ঘন ঝোপের ধারে একটা চিতা-পরিবারের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। বাঘ ও বাঘিনী তাদের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে খেলা কর্‌ছিল। গাড়ীর শব্দে চিতাবাঘ ও বাঘিনী তৎক্ষণাৎ

ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিলে। কিন্তু বাচ্চাগুলো বাপ-মায়ের সঙ্গ নিতে পার্‌লে না—শিকারীদের হাতে ধরা পড়্‌ল। বেচারাদের তখনও দাঁত ওঠে নি। বাঘিনী গা-ঢাকা দিলেও—কাছেই ছিল। বাচ্চাগুলো ধরা পড়াতে সে গাড়ীর পাশে পাশে চল্‌তে চল্‌তে ঝোপের আড়াল থেকে রাগে গোঙাতে লাগ্‌ল। বলদগুলোও বাঘের বাচ্চা বয়ে নিয়ে যেতে নারাজ। অগত্যা তা'রা বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলে। মঙ্গরুর কিন্তু ইচ্ছা ছিল, সেগুলোকে সঙ্গে নেয়। যা' হোক্ এই বনখানা পার হবার আগেই সন্ধ্যা লেগে গেল।

রাতের বেলা এক পাল বুনো কুকুর তাদের আস্তানার চারধারে হানা দিলে। অন্ধকারে দূরে হাতীর ডাক ও সিংহের গর্জ্জনও শোনা গেল। ভোরের বেলা এক যোড়া চিতা তাদের আস্তানার কিছু দূরে একটা জেব্রাকে মেরে কড়্‌মড়্‌ শব্দে খেতে সুরু ক'রে দিলে। সেখান দিয়ে এক যোড়া শূকর তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিল। চিতাগুলোর সঙ্গে কি কারণে যেন তাদের ঝগড়া বেধে গেল। অম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা ছোট-খাট কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হ'ল! চিতাবাঘের থাবা ও শূকরের দাঁতের আঘাতে পরস্পরের গা ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত। তাদের তর্জ্জনে গর্জ্জনে নিস্তব্ধ

গভীর বনটাকে ভয়ানক মনে হতে লাগ্‌ল। যুদ্ধটা কিছুক্ষণ চল্‌ল, তারপর হঠাৎ সব চুপ্‌চাপ্‌। ততক্ষণে আর একটু ফর্সা হয়েছে। সেই আলোয় তা'রা দেখ্‌লে, একটা সিংহ সেখানে ঘোরাফেরা কর্‌ছে। বোধ হয় তার ভয়েই যোদ্ধারা হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে স'রে পড়েছে। যাই হোক, সিংহটারও কি মতলব ঠিক জানা গেল না; তবে সে জ্বলন্ত চোখে বার কয়েক বলদগুলোর দিকে তাকিয়েই বনের আড়ালে গা-ঢাকা দিলে।

সকাল হলেই তা'রা আবার চল্‌তে সুরু কর্‌লে।

মঙ্গরু বল্লে—"আর সাতটা দিন পরই গরীলাদের দেশে পৌঁছ্‌ব।"

প্রায় ঘণ্টা দুই চ'লে তা'রা বনের কিনারে একটা সুবিশাল মাঠের ধারে পৌঁছ্‌ল। সে মাঠটা যেন সবুজের সমুদ্র—উঁচু-নীচু জমি, সবুজ ও লম্বা ঘাসে ঢাকা। ওপরে গাঢ় নীল আকাশ। বাঁ দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে মঙ্গরু বল্লে—"ঐ দেখুন হুজুর, দূরে—বহু দূরে মেঘের মত ঐ যে পাহাড় উঠেছে—ঐখানে থাকে গরীলা।"

সকলে সেইদিক-পানে দৃষ্টি সঙ্কুচিত ক'রে তাকিয়ে রইল। চোখে দেখ্‌তে না পেলেও মনে মনে কল্পনা ক'রে নিল—পাহাড়ের নীচে গভীর বন, তার মধ্যে গরীলারা ঘুরে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। তিনজনেই তখন গরীলাদের চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ মঙ্গরু ও ডেম্বা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"দেখুন, দেখুন হুজুর, সাম্‌নে কি!"

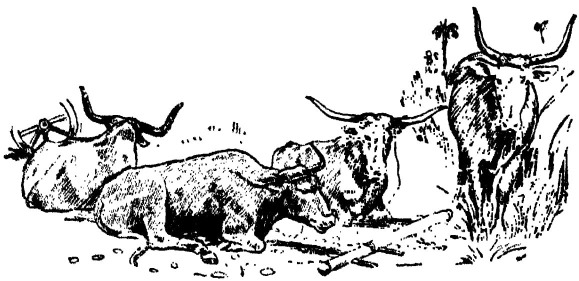


হরিণপাল ছুট্‌ছে

তা'রা তাকিয়ে দেখে, হাজার হাজার হরিণ ছুটে' চলেছে সেই মাঠের ওপর দিয়ে—যেন এক বিরাট নদী। তাদের খুরের শব্দ ও ডাকাডাকি জলধারার শব্দের মত বোধ হতে লাগ্‌ল। হরিণগুলোর পায়ে পায়ে ধূলো উড়্‌ছে—তাতে আকাশ প্রায় ঢেকে গেল। তিনবন্ধু এমন দৃশ্য জীবনে

কখন দেখে নি। স্রোতটা দক্ষিণদিক্ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলেছিল। প্রায় ছ'ঘণ্টা কেটে গেল, তবু সে স্রোত শেষ হয় না। এই হরিণের দলের পিছনেই ছিল—প্রকাণ্ড এক জেব্রার পাল। এরা মাঠের সীমা-রেখায় মিলিয়ে যেতে প্রায় বেলা প'ড়ে এল। শিকারীরা তখন মাঠটার মাঝখানে।

আবার একপাল জীরাফ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাঠ পাড়ি দিতে লাগ্‌ল। তাদের পিছনেই এক যোড়া সিংহও ছুটে' আস্‌ছে। কিছুক্ষণ তাদের দেখা গেল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার এসে এই অদ্ভুত দৃশ্যখানি ঢেকে ফেল্‌লে। জীরাফগুলোর কি হ'ল জানা গেল না। সে রাত তা'রা সেই মাঠের মাঝখানেই কাটাল।



কিন্তু পরদিন রওনা হবার সময় দেখা গেল, তিনটা বলদের ঘুম-রোগ ধরেছে। তা'রা উঠ্‌তে পার্‌ছে না।

বাকী তিনটে তখনও নীরোগ ছিল। গাড়োয়ান বল্লে—"হুজুর, আর রক্ষে নেই। এই মাঠে তেৎসী মাছির উৎপাত। তাদের কামড়েই বলদগুলোর অমন দশা। এ তিনটেকেও আজ পোকাগুলো মেরে ফেল্‌বে।"

কথাটা শুনেই তিন শিকারীর মুখ শুকিয়ে গেল। উপায়? এখনও যে বহুদূর যেতে হবে। গাড়ীতে বিছানা, বাক্স, শিকারের সরঞ্জাম, খাদ্য, জলের জালা ইত্যাদি অনেক জিনিস আছে যে!

শোভনলাল বল্লে—"কোন রকমে এই মাঠটা যদি পাড়ি দিয়ে কোন নিগ্রোপল্লীতে পৌঁছান যায়, তা' হলে হয়ত গোটাকয়েক বলদ পাওয়া যেতে পারে। এই মাঠখানা আমরা হেঁটেই যাব।"

তার কথামতই কাজ সুরু হ'ল; দুটো বলদকে গাড়ীতে জুড়ে, একটা বলদকে পিছনে বেঁধে নিয়ে তা'রা হেঁটেই রওনা হ'ল। ঘুমন্ত বলদ তিনটে সেইখানে প'ড়ে রইল।

মঙ্গরু বল্লে—"এল ব'লে হুজুর।"

—"কি রে?"

—"সিংহ। বলদগুলো আজ তাদেরই পেট ভরাবে।"

তেৎসী মাছি আমাদের এই ঘরো-মাছির মতই বড়। কেবল চারখানি পায়ে ডোরাকাটা আর গায়ের রঙ একটু

হল্‌দে। মাছিগুলো রক্ত চুষে খায়। তাদের কামড়ে মানুষ বা বুনো গরু-মহিষের কিছু হয় না; মরে—পোষা গরু-মহিষ-ঘোড়া। তেৎসী কামড়ালে এদের ঘুম পায়।

কিন্তু এই বলদ তিনটেও বাকী রইল না; সন্ধ্যাবেলায় মাঠের শেষে পৌঁছেই শুয়ে পড়্‌ল। এই বিপদের ওপর আবার আর এক বিপদ্। কাছেই ছিল এক নিগ্রোপল্লী। মাস কয়েক আগে এক দাস-ব্যবসায়ী এই গাঁ থেকে ছেলেমেয়ে বুড়ো-জোয়ান অনেককে দাসরূপে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় এদের বাড়ী-ঘর ভেঙে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়; অনেককে খুন-জখমও করে। দূর থেকে শিকারীদের দেখে নিগ্রোরা মনে কর্‌লে, এরাও বুঝি দাস-ব্যবসায়ী। তাদের সর্দ্দারের কাছে এই খবর যেতেই সে হুকুম দিলে—"ওদের ওপর তীর চালাও।"

ভাগ্যে তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছিল—না হলে একজনেরও প্রাণ বাঁচ্‌ত না। নিগ্রোরা ঝোপের আড়াল থেকে সোঁ-সোঁ ক'রে তীর চালাতে লাগ্‌ল। সর্ব্বনাশ! শিকারীরা সকলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়্‌ল।

শোভনলাল বল্লে—"চালাও গুলি।"

তিনজনে বন্দুক তুল্‌তেই মঙ্গরু বল্লে—"গুলি কর্‌বেন না হুজুর। ওরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। মরিয়া হয়ে

লড়্‌বে।” ব’লে সে চীৎকার ক’রে বল্‌তে লাগ্‌ল—“আমরা দাস-ব্যবসায়ী নই, গায়ের রঙও সাদা নয়। আমরা কালো মানুষ। আমার নাম মাকুরুরু—সঙ্গীর নাম ডেম্বা।”

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই তুষমনের মত জন পনেরো নিগ্রো এসে চারদিক্‌ থেকে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বর্শা উঁচিয়ে বল্লে—“ওঠ।”

কথামত তা’রা উঠে’ দাঁড়াতে নিগ্রোরা সকলকে বন্দী ক’রে সর্দ্দারের কাছে নিয়ে গেল, জিনিসপত্রও যা ছিল সব তা’রা লুঠ ক’রে নিল।

সর্দ্দার তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, একটা গাছের তলায় ব’সে ছিল। শিকারীদের দেখে লাল চোখ তুটো আরও লাল ক’রে বল্লে—“কাল এদের বিচার হবে।”

মঙ্গরু বল্লে—“আমরা দস্যু বা দাস-ব্যবসায়ী নই। আমাদের ছেড়ে দিন্‌।”

সর্দ্দার বল্লে—“তোমাদের সঙ্গে কি আছে?

যে সকল জিনিস ছিল, মঙ্গরু তার ফর্দ্দ দিলে।

সর্দ্দার তার অনুচরদের হুকুম দিলে—“নিয়ে এস সব এইখানে।”

কিন্তু আন্‌বে কি? সব তো আগেই গাপ্‌ হয়ে গেছে। গুলি-বারুদগুলো ও গোটা তুই বর্শা তখনও গাড়ীর মধ্যে ছিল।

একজন সেইগুলো সর্দ্দারের সাম্‌নে এনে রাখ্‌তেই সর্দ্দার বল্লে—"আর সব জিনিস কোথায় ?"

সে বল্লে—"যা ছিল এই ।"

মঙ্গরু বল্লে—"সর্দ্দার, ওরা সব চুরি ক'রে নিয়েছে—"

যারা তাদের বন্দী ক'রে এনেছিল, তা'রা এই কথা শুনে ব'লে উঠ্‌ল—"কখনও না, কখনও না। তোমরা সর্দ্দারকে ফাঁকি দিচ্ছ !"

মঙ্গরুরা ব'লে উঠ্‌ল—"না—না—"

কিন্তু তাদের কথা তখন কে শোনে ? সভায় একটা গোলমাল আরম্ভ হ'ল ।

সর্দ্দার বল্লে—"ওদের ঐ ঘরে বন্দী ক'রে রাখ। কাল ওদের মাথার ঘিলু দিয়ে দেবতার পূজো হবে ।"

রাগে সর্দ্দারের শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মুখ-চোখের চেহারা হ'ল ভয়ঙ্কর ।

সর্দ্দারের হুকুম শুনে মঙ্গরু ও ডেম্বা কেঁদে উঠ্‌ল ; কিন্তু শিকারী তিনজন চুপ ।

সর্দ্দারের হুকুম তখনই তামিল হ'ল ।

সর্দ্দার মজলিশ ভেঙে চ'লে গেল। যারা তাদের বন্দী ক'রে এনেছিল, তাদের মধ্যে চারজন সেই ঘরের দরজায় বর্শা হাতে পাহারা দিতে লাগ্‌ল ।

শোভনলাল সঙ্গীদের চুপি চুপি বল্লে—"ভয় নেই। আমাদের আটকায় কে ?"

কিন্তু পাঁচজনেই পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় সকলেরই শরীর অবসন্ন। তবুও বাঁচ্‌বার জন্য লোকে কোন্ কষ্টই বা না সহ্য কর্‌তে পারে ?

ঘর অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার বনভূমি। রাত ক্রমে বেড়ে চল্‌ল। প্রহরীরা হাতে মশাল নিয়ে মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে এসে বন্দীদের সাড়া দিয়ে যায়। এমনি ক'রে কিছুক্ষণ কেটে গেল। মাঝে মাঝে বনের মাঝ থেকে সিংহের গর্জ্জন ও হায়েনার অট্টহাসি শোনা যায়। ক্রমে প্রহরীদের চোখে ঘুম নেমে এল। কিন্তু পাঁচটি বন্দীর চোখে আর ঘুম নেই।

শোভনলাল চাপা গলায় বল্লে—"বোকা সর্দ্দার! বর্শা-বন্দুক ও গুলি-বারুদগুলো আমাদের সাম্‌নেই রেখে গেল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ আমরা কেন নিশ্চয়ই মুক্ত হ'ব ? গুলি-বারুদগুলো সব যে যা পার বেঁধে নাও।"

মঙ্গরু ও ডেম্বা বর্শা দু'খানা পাশে রাখ্‌লে। তিন শিকারী গুলি-বারুদ বেঁধে নিলে। তার কিছুক্ষণ পরে দেওয়ালের গায়ে শব্দ উঠ্‌ল—টক্-টক্-টক্-টক্!

অমনি একজন প্রহরী হুঙ্কার দিয়ে মশাল হাতে ঘরের মধ্যে ছুটে এল। কিন্তু দেখ্‌লে বন্দীরা সব অঘোরে ঘুমিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। আবার টক্-টক্-টক্-টক্!

এবারও প্রহরীরা সাড়া দিলে, কিন্তু একটু দেরী ক'রে। ঘরের মধ্যেও কেউ এল না।

আবার সব চুপ।

কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ উঠ্‌ল—খট্-খট্-খট্-খট্!

কিন্তু প্রহরীরা এবার কেউ সাড়া দিলে না।

শোভনলাল আস্তে আস্তে উঠে' বেড়ার ফাঁকে দেখ্‌লে দু'জন প্রহরী সটান শুয়ে পড়েছে, দু'জন ব'সে ঢুল্‌ছে, আর মাটিতে পোঁতা মশালটাও প্রায় নিবু নিবু; সেটারও যেন ঘুম এসেছে। সে স'রে এসে চুপি চুপি সঙ্গীদের বল্লে— "প্রস্তুত হও, চল। আর এক মিনিটও সময় নষ্ট কর্‌লে সকলকে কাল নিশ্চয়ই মর্‌তে হবে।"

সঙ্গীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল—তার কথা শুনে উঠে' দাঁড়াল।

কিন্তু যেমনই তা'রা ঘরের বাইরে পা দিয়েছে অমনি সেই প্রহরী দু'জনের ঘুম ছুটে' গেল। তা'রা তড়াক ক'রে উঠে' দাঁড়াল। কিন্তু কারও চীৎকার কর্‌বারও অবসর হ'ল না— সাঁড়াশীর মত চারখানি হাত এসে দু'জনের গলা চেপে ধর্‌ল। রতন ছুটে' গিয়ে মশালটা নিভিয়ে ফেল্‌লে। অন্ধকারে সেই প্রহরী দু'জনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্‌ল।

ঘুমন্ত প্রহরী দু'জনও সেই শব্দে উঠে' বস্‌ল। কিন্তু

অন্ধকারে ও ঘুমের চোখে ব্যাপারটা ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না, তবুও চীৎকার ক'রে উঠল।



সাঁড়াশির মত চারখানি হাত দু'জনের গলা চেপে ধরল

এদিকে বন্দীদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তা'রা প্রহরী

দু'জনের অসাড় দেহ দুটো ফেলে দিয়ে দৌড়—দৌড়—দৌড়। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, তার ঠিক নেই। অন্ধকার বনের মধ্য দিয়ে পাঁচজনে কেবলই ছুটতে লাগ্‌ল।

ওদিকে সারা নিগ্রোপল্লী প্রহরীদের চীৎকারে তখন জেগে উঠেছে; তা'রাও মশাল হাতে তাদের পিছু নিলে। ছুটতে ছুটতে তাদের মশালের আলো দেখা যেতে লাগ্‌ল। ধনুক, বর্শা, নবকেরী (লোহার গদা) প্রভৃতি হাতে নিয়ে নিগ্রোরা চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে চারদিকে ছুটাছুটি কর্‌ছে।

বন্দীদেরও ছোটার আর বিরাম নেই। প্রাণের ভয়ে তা'রা কেবলই চল্‌ছে। ছুটতে ছুটতে শেষে পাঁচজনেই মাইল দুই দূরে সেই মাঠের একধারে এসে পড়্‌ল। নিগ্রোদের জনকতক সেইদিক্-পানে আস্‌ছিল। তাদের বিকট চীৎকার শোনা যেতে লাগ্‌ল। আবার ছুট!



মশাল হাতে ছুটল

কিন্তু এবার সকলেই অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল; আর ছুটতে

পারে না। নিগ্রোদের চীৎকারও ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। শোভনলাল বল্লে—"সকলে হেঁটেই চল। যদি নিতান্তই ওদের হাতে পড়ি, লড়াই ক'রে মর্‌ব।"

চীৎকারটা ক্রমেই কাছে—আরও কাছে এসে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। ঐ যে বনের অন্ধকারে দুই-তিনটি মশাল দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চীৎকারটা যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল। ভাবে মনে হ'ল—নিগ্রোগুলো পিছন ফিরে দৌড়াচ্ছে। ভাল ক'রে কান পেতে তা'রা শুন্‌তে পেল, নিগ্রোগুলো চীৎকার কর্‌ছে—"চিতা—চিতা।" ব্যস্‌! আর ভয় নেই। চিতাবাঘ তাদের সে বিপদ্‌ থেকে উদ্ধার কর্‌ল। চিতাবাঘকে নিগ্রোরা বড় ভয় করে।

ওদিকে পূব আকাশটা একটু ফর্সা হয়ে এসেছে। বন-প্রান্তরের চেহারা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। পাঁচজনেই খুব পরিশ্রান্ত। তবু তা'রা বিশ্রাম না ক'রে বনের কিনারে কিনারে চল্‌তে লাগ্‌ল।

আট

চারধার তখন আলোয় ভ'রে উঠেছে। সেই গাঁ-খানাও প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে। তৃষ্ণায় সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ, ক্ষুধায় পেট জ্বল্‌ছে। আপাততঃ কিছু জল পেলেও হয়; কিন্তু কাছে-কিনারে কোথাও যে জল আছে, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

মঙ্গরু ছিল দলের সকলের আগে; সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"হুজুর, কাছে জল আছে, তাড়াতাড়ি আসুন"—ব'লে সে একটা গাছের শিকড়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

সকলে দেখ্‌লে, একটা প্রকাণ্ড ব্যাং—মাটি থেকে প্রায় পৌনে এক হাত উঁচু গাছের নীচে গম্ভীর হয়ে ব'সে আছে। তার গলাটা তুল্‌-তুল্‌ ক'রে নড়্‌ছে, আর গোল গোল চোখ দুটো থেকে থেকে ঘুর্‌ছে। তার রকম দেখে সকলের হাসি এল। তখন কাছে যেতেই ব্যাংটা সেখান থেকে প্রকাণ্ড এক লাফে হাত কয়েক দূরে গিয়ে থপ্‌ ক'রে বস্‌ল।

মঙ্গরু বল্লে—"ব্যাংগুলো থাকে জলে।"

কিন্তু কথাটা শেষ না ক'রেই সে কান খাড়া ক'রে কি যেন শুন্‌তে লাগ্‌ল। ডেম্বাও চুপ ক'রে কি যেন শুন্‌ছে। তারপর দু'জনেই হঠাৎ একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"নূ।"

নূ হরিণের মতই এক রকম জন্তু—চেহারাটা না-হরিণ, না-মহিষ, না-ঘোড়া। মুখ আর পা হরিণের মত, মাথাটা মহিষের আর পিছনটা ঘোড়ার মত। শিকারীরাও তিনজনে শব্দটা শুন্‌তে পেল। তারপর সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে সকলে বনের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল।


নূ

কিছুদূর চ'লেই তা'রা একটা ছোট নদীর কিনারে এসে পড়্‌ল। নদীটার নাম কুবাঙ্গো—মাত্র হাত পঁচিশ-তিরিশ চওড়া; কিন্তু জলে খুব স্রোত। নদীটা গিয়ে পড়েছে সেই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতে। দুটি তীরে ঘন গাছপালা। তা'রা দেখ্‌লে নদীর ওপারে এক পাল নূ—ষাট কি সত্তরটা হবে—জল খেতে এসেছে। শিকারীরা এপারের ঝোপের আড়াল থেকে তাদের কিছুক্ষণ দেখ্‌লে। তারপর তিনজনে তিনটিকে লক্ষ্য ক'রে গুলি কর্‌লে। গুলির আঘাতে দুটো নদীর কিনারেই লুটিয়ে পড়্‌ল, আর একটা

দলের সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মঙ্গরু বল্লে—"আমাদের এই নদীটা পার হয়েই যেতে হবে। নদীতে জলও বেশী নেই।"

শোভনলাল বল্লে—"তবে তুই আর ডেম্বা আগে পার হ'। জল বেশী থাক্‌লে গুলি-বারুদ-বন্দুক নিয়ে সাঁতার দেওয়া যাবে না। সবই তো গেছে; এগুলো গেলে আর রক্ষে নেই।"

তার কথামত মঙ্গরু ও ডেম্বা জলে নেমে গেল। তা'রা মাঝ বরাবর গেছে, এমন সময় এক যোড়া জলহাতী অতশত কিছু না জেনে তাদের দিকেই ছুটে' আস্‌তে লাগ্‌ল। মাঝখানে জল প্রায় গলা সমান। স্রোত প্রবল হলেও আস্তে আস্তে হেঁটে পার হওয়া যায়। মঙ্গরুরা জলহাতী দুটোকে দেখ্‌তে পায় নি। শিকারীদেরও চোখ ছিল—পিছনে এক যোড়া গণ্ডারের দিকে। গণ্ডার দুটো বোধ হয় নদীতে জল খেতে এসেছিল। কিন্তু মানুষের সাড়া পেয়ে জলে না নেমে সেখানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বীরেন্দ্র একটাকে গুলি করবার জন্যে বন্দুক তুল্‌তেই মঙ্গরুরা দু'জনে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। তিনজনে তাকিয়ে দেখে, মঙ্গরু আর ডেম্বা স্রোতের টানে ভেসে চলেছে আর তাদের পিছনে সেই জলহাতী দুটো। এমন ব্যাপারে হাতী

দুটোও ভড়্‌কে গেল। তারপরই তা'রা ঝোঁক্‌টা সাম্‌লে নিয়ে রাগে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করতে করতে মঙ্গরুদের তাড়া ক'রে চল্‌ল।

শিকারীরা তো হতভম্ব। হাতী দুটোকে গুলি করারও উপায় নেই, তাদের কয়েক হাত আগেই মঙ্গরুরা! তা'রা তিনজন তীর ধ'রে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কেবল চীৎকার করতে



···পিছনে সেই জলহাতী দুটো

লাগ্‌ল। কিন্তু নদীটা সেখানে খুব সরু আর জল মাত্র কোমর সমান হওয়ায়, জলহাতী দুটো আর না এগিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। মঙ্গরুরাও সেই সুযোগে একেবারে কূলে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু শিকারীদের হাতী দুটোকে শিকার কর্‌বার সুযোগ হ'ল না। ঠিক তখনই একদল বেবুন কোথা থেকে যেন লাফাতে লাফাতে তাদের সমুখে এসে দাঁড়াল—অবশ্য মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। বেবুনের দল শিকারীদের দিকে

মিটি-মিটি চোখে তাকিয়ে বনের মধ্যে চ'লে গেল। জলহাতী দুটো ততক্ষণ ডুব দিয়ে উজিয়ে চলেছে। শিকারীরা তাকিয়ে দেখে, জলহাতী দুটো নেই। মঙ্গরুরা দু'জনে ওপারে নূ দুটোকে কিছুদূরে ফাঁকা জায়গাটার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

তা'রা তিনজনে সেইখান দিয়ে নদী পার হ'য়ে ওপারে উঠ্‌ল; তারপর নূ দুটোর ছাল ছাড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে



বেবুনের দল

সদ্ব্যবহারে লেগে গেল। আবার যখন চলা সুরু কর্‌লে, তখন বেলা দুপুর।

শেষবেলার দিকে বনের মধ্যে আবার একখানা গাঁ তাদের চোখে পড়্‌ল। কিন্তু বিপদের ভয়ে এবার গাঁয়ের ত্রি-সীমানাতে তা'রা ঘেঁষ্‌ল না। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চ'লে সন্ধ্যাবেলা একটা অতি প্রকাণ্ড মোয়ানা গাছের তলায় এসে আস্তানা গাড়্‌ল।

গাছটার গুঁড়িটার বেড় প্রায় ত্রিশ হাত; গুঁড়িটা মাটি

থেকে হাত নয়-দশ সোজা উঠে' গেছে। মোটা ডালগুলো চারদিকে বিস্তৃত। গাছটাকে দূর থেকে হঠাৎ মনে হয় যেন একটা পাহাড়। তার বয়সও হয়ত পাঁচ-ছ' শ বছর হবে। ডালে ডালে নানা রকম পাখীর মেলা। পাখীদের কলরবে বনভূমি ভ'রে উঠেছে।

পরদিন সেখান থেকে রওনা হয়ে চল্‌তে চল্‌তে তা'রা চারদিন পরে জাম্বেজী নদীর ধারে পৌঁছ্‌ল। আর, সেখান থেকে বনটাও হয়ে উঠ্‌ল আরও গভীর। মাঝে মাঝে হাতীর পাল, জীরাফ, জেব্রা, গণ্ডার, বুনো মহিষ, কোয়াগা, চিতা চোখে পড়ে; সারারাত ধ'রে সিংহের গর্জ্জন শোনা যায়।



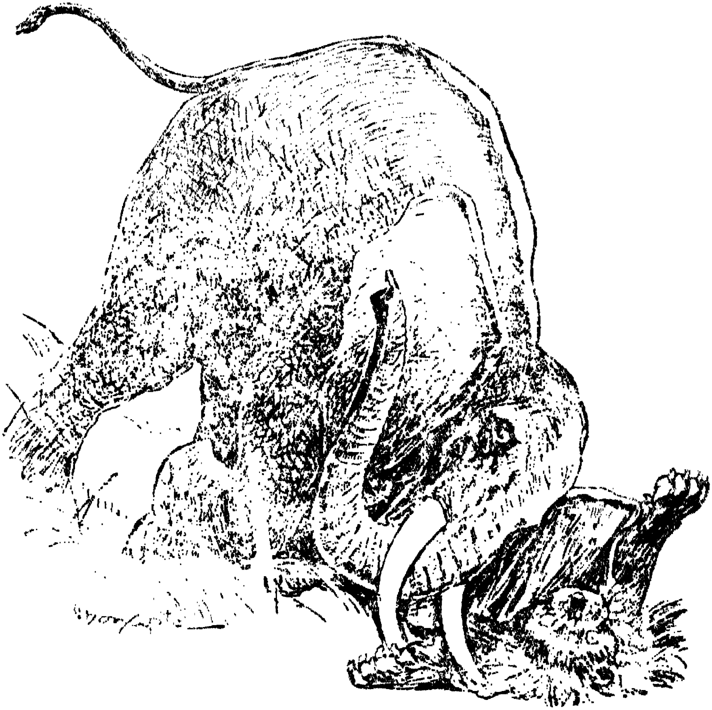
জেব্রা

জাম্বেজী নদীর ধারে এক জায়গায় এসে তা'রা অবাক্ হয়ে দাঁড়াল। সমুখে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ চল্‌ছে। একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতীর সঙ্গে একটা সিংহের লড়াই হচ্ছে। তা'রা পাঁচজনে ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ঝোপের ডালপালা একটু ফাঁক ক'রে ব্যাপারটা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এতটুকু প্রাণী সিংহ; কিন্তু কি তার বিক্রম! মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জনে সারা বন কেঁপে উঠ্‌ছে—উল্কাবেগে ছুটে' গিয়ে সে

হাতীটাকে আক্রমণ করছে। হাতীটার পিছনের পা দুটি তার দাঁত ও নখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ক্ষতগুলো দিয়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে রক্ত ঝরছে। হাতীটার কিন্তু লড়াইয়ের দিকে মন নেই; সে পালাবার জন্য ব্যস্ত। তবে একবার শুঁড় তুলে চীৎকার ক'রে সিংহটার দিকে ধেয়ে এল। অমনি সিংহটা স্প্রীংয়ের মত লাফিয়ে স'রে দাঁড়াল; আবার হাতীটা পিছন ফির্‌তেই তার পায়ে গিয়ে কামড় দিয়ে পিঠের ওপর ওঠ্‌বার চেষ্টা করলে।

বার কয়েক এমনি কাণ্ড চল্‌বার পর সিংহটা হাতীটার কান কাম্‌ড়ে ধরল। তখন হাতীটার অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর; একটা বিকট শব্দ ক'রে সে পাগলের মত এদিক্ ওদিক্ ছুট্‌তে লাগল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে কান ঝাড়া দেয়, মাথা নাড়ে—সিংহটাকে তবুও ফেল্‌তে পারে না। অবশেষে সে হুড়মুড় ক'রে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। সিংহটাও সেই সুযোগে লাফিয়ে তার মাথায় উঠ্‌তে যেতেই তার পিছনের পা দু'খানি হাতীটার মাথার নীচে চাপা পড়ল। সেই দারুণ চাপ সহ্য ক'রে বেঁচে থাকে এমন প্রাণী সংসারে ক'টা আছে? পশুরাজ একটা হুঙ্কার ছেড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। হাতীটার তখন কি রাগ। উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা দিয়ে সিংহের সেই প্রাণহীন দেহটাকে থেৎলে থেৎলে নাড়ী-ভুঁড়ি

বার ক'রে পাঁপরের মত ক'রে ফেললে। তবুও তার রাগ গেল না। সেই নরম তুল্‌তুলে দেহটাকে শুঁড়ে তুলে দূরে



হাতীর চাপে পশুরাজ প্রাণত্যাগ করলেন

একটা ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মহাবিক্রমে হেল্‌তে তুল্‌তে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নয়

তা'রা চলেছে—

জাম্বেজী নদী ডানদিকে তিনদিনের পথে প'ড়ে রইল—সম্মুখে সেই মিশকালো পাহাড়টা—মেঘের মধ্যে উঠে' গেছে। তা'রা সেইদিকেই চলেছে।

কি গভীর বন! পাঁচ হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। গাছে লতায় পাতায় চাব্ড়া বেঁধে আছে। ওপরে আকাশ দেখা যায় না, তলায় সূর্য্যের আলো পড়ে না। সে যেন চির-রাতের দেশ। তার মধ্যে শিকারীদেরও গা ছম্-ছম্ কর্‌তে লাগ্‌ল। বনটা আবার জায়গায় জায়গায় অল্প ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গার ওপর বড় বড় পাথর প'ড়ে আছে; কোথাও ছোট ছোট গর্ত্ত। গর্ত্তের মধ্যে জল। এমন বন—তবু একটি প্রাণীরও সাড়া নেই, এমন কি একটি পাখীও ডাক্‌ছে না। বন জুড়ে কেবল ঝিঁঝিপোকার দল একটানা চীৎকার ক'রে গলা ফাটাচ্ছে। এমনি বনে যে প্রাণী বাস করে, তা ভয়ঙ্কর বৈ কি!

মাইল কতক চল্‌বার পর হঠাৎ এক জায়গায় তা'রা দেখ্‌ল—মাটির ওপর পায়ের দাগ—প্রকাণ্ড; যেন ভীমের পা! কি মোটা আঙ্গুলগুলো!

রতন বল্লে—"এ হাতীর পায়ের দাগ।"

ডেম্বা ও মঙ্গরু বল্লে—"এই তো গরীলার পায়ের দাগ।"

—"কি ক'রে বুঝ্‌লি?"

—"জানি, হুজুর!"

শোভনলাল বল্লে—"গরীলাই যদি হয়, তা' হলে এপথ দিয়ে কিছুদিন আগে সে চ'লে গেছে।"

তার কথা শুনে ডেম্বা ও মঙ্গরু হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল; বল্লে—"না হুজুর! এ নতুন দাগ। ঐ দেখুন না, একটা ছোট শুক্‌নো গাছের ডাল দাগটার ওপর ভেঙে প'ড়ে রয়েছে। এখনও সাদা—"

তখন সকলে ঝুঁকে প'ড়ে ডালটাকে পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল। হাঁ, নিগ্রোদের কথাই ঠিক। এসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান বড় পাকা। সকলে মুখ তুলে দেখে—আরও কয়েকটা দাগ; দাগগুলো সমুখে বনের মধ্যে চ'লে গেছে। অমনি তিনজনে বন্দুক পরীক্ষা ক'রে কোমরের ছোরাগুলোকে বেশ শক্ত ক'রে বাঁধ্‌ল। মঙ্গরু এবং ডেম্বাও তাদের বর্শাগুলো ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে হাতের সাড় ভেঙে নিলে। তারপর সকলে সারি বেঁধে বনের মধ্যে ঢুক্‌ল—আগে শোভন, তারপর বীরেন্দ্র তারপরই মঙ্গরু ও ডেম্বা—আর সকলের শেষে রতন।

তা'রা চলেছে কখনও সোজা হয়ে, কখনও নীচু হয়ে,

কখনও বুকে হেঁটে, কখনও এঁকে-বেঁকে, চোরের মত চুপি-চুপি। এমনি ক'রে বনের মধ্য দিয়ে প্রায় এক মাইল চ'লে গেল, তবু গরীলা বা একটি শিয়ালেরও দেখা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা গাছের ছয়-সাত ইঞ্চি মোটা ডাল ভাঙা রয়েছে দেখা গেল।

মঙ্গরু চাপা গলায় বল্লে—"গরীলা ভেঙেছে।"

যে-জন্তু এমন একটা ডাল ভাঙ্‌তে পারে, তার গায়ে কি ভয়ানক শক্তি! গরীলাটা সেখান দিয়ে যাবার সময় ডালগুলো ভেঙে বোধ হয় পথ ক'রে নিয়েছিল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে ডেম্বা ও মঙ্গরু থম্‌কে দাঁড়াল। তাদের মুখ-চোখের চেহারা তখন বড় অদ্ভুত। চোখ দুটো বড় বড়, নাকটা ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছে, কান দুটো যেন খাড়া, সারা দেহ স্থির। শিকারীরা তিনজনেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে গভীর বন ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে। মঙ্গরু চুপি চুপি বল্লে—"ঐ শুনুন, হুজুর!"

শিকারীরাও এবার শুন্‌তে পেলে, ডালপালা ভাঙার মড়্‌মড়্‌ শব্দ—কিন্তু দূরে।

মঙ্গরু বল্লে—"গরীলা—সাবধান, হুজুর। গরীলারা সামান্য শব্দও শুন্‌তে পায়, ওদের চোখের দৃষ্টিও বড় তীক্ষ্ণ।"

শিকারীরা আর তিলমাত্রও সময় নষ্ট না ক'রে সেদিক্‌-পানে এগিয়ে চল্‌ল খুব চুপে চুপে।

শব্দটাও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষে একেবারে কাছে। সকলে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বনটা সেখানে এত গভীর যে, সমুখে বা আশে-পাশে কি আছে দেখা যায় না।

শোভনলাল এক পা এগিয়ে গেল, তবু শব্দই আসে, কিছু দেখা যায় না। আরও এক পা। কৈ কোথায় কি?—আবার এক পা খুব ধীরে;—না কিছুই নেই ত! তারপর আরও এক পা এবং আরও এক পা বাড়াতে গিয়েই—ঐ যে! শোভনলাল দেখ্‌লে সমুখে গোটা কয়েক পাতার ফাঁকে বানরের মত লোমে ঢাকা একটা কালো দেহের খানিকটা অংশ—ঐ ত গরীলা!

কিন্তু সেটা দেহের কোন্‌ অংশ ঠিক মত ঠাহর করতে পারলে না। তার মনে হ'ল যেন বুক। সে সেই জায়গা লক্ষ্য ক'রেই একসঙ্গে যোড়া-গুলি চালালে। অমনি সারা বন কাঁপিয়ে উঠ্‌ল এক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। কোথায় লাগে সে গর্জ্জনের কাছে সিংহের নিনাদ। গরীলাটা একটানে তার সাম্‌নের মোটা ডালটা ভেঙে ফেল্‌লে।

এবার জন্তুটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। প্রকাণ্ড দেহ। লাল চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত ঘুর্‌ছে, চোখা চোখা দাঁতগুলো রাগে, যন্ত্রণায় বেরিয়ে পড়েছে। এক একবার নিজের চওড়া বুকখানার ওপর ধুম্‌ধুম্‌ ক'রে ঘুষি মারে; এক একবার এক একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কাম্‌ড়ে ভেঙে টুক্‌রো

টুক্‌রো ক'রে ফেলে দেয়; হুঙ্কার ছাড়ে, এপাশে ওপাশে হেলে পড়ে। কিন্তু তার উঠে' দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। শোভনলালের গুলিতে তার কোমরটা একদম ভেঙে গেছে। তবু গরীলাটা একবার উঠে' দাঁড়াল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা—দাঁড়িয়েই মাটিতে প'ড়ে গেল। তারপরই তু'হাতের ওপর ভর দিয়ে শিকারীদের দিকে লাফিয়ে এল। ঠিক তখনই মাথায় আবার একটা গুলি। গরীলাটা মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল। এবার আর তার উঠ্‌বারও সামর্থ্য রইল না। উপুড় হয়ে প'ড়ে গোঙাতে লাগ্‌ল—ঠিক যেন একটা মানুষ যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে! তারপর সব শেষ। অমন বিক্রমশালী জন্তু মানুষের পায়ের কাছে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে রইল।

সে রাতখানা তা'রা সেখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে তু'একটা গরীলা চোখে পড়ে; কিন্তু শিকারীদের সাড়া পেয়ে তা'রা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এক জায়গায় দেখ্‌লে এক গরীলা-মাতা তার বাচ্চাটিকে কোলে ক'রে তুধ দিচ্ছে। শিকারীদের দেখেই মা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, কিন্তু শিকারীদের সে আক্রমণ করলে না। বাচ্চাটিকে বুকে চেপে কখনও মানুষের মত তু'পায়ে উঠে' কখনও চারপায়ের ওপর ভর দিয়ে বানরের মত ছুটে' পালাতে লাগ্‌ল।

আরও কিছুদূর গিয়ে শিকারীরা একটা পাহাড়ের তলায় পৌঁছুতেই হঠাৎ একটা বিকট গর্জ্জন শুনতে পেলে। শব্দটা সমুখের বনের মধ্য থেকে উঠ্‌ছিল। তা'রা আর না এগিয়ে সেখানেই থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর দেখ্‌লে প্রকাণ্ড এক গরীলা তাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আস্‌ছে। গরীলাটা কয়েক পা আসে, আর থম্‌কে দাঁড়িয়ে ধুম্‌ধুম্ ক'রে বুকের ওপর ঘুষি মারে; সঙ্গে সঙ্গে বিকট হুঙ্কার ছাড়ে। সে শব্দে মনে হতে লাগ্‌ল, বুঝি বা কানের পর্দ্দা ফেটে যাবে। শোভনলাল গরীলাটাকে গুলি কর্‌বার জন্যে বন্দুক তুল্লে। বীরেন্দ্র বল্লে—"এবার আমার পালা।"

গরীলাটা ততক্ষণে হাত দশেকের মধ্যে এসে পড়েছে। এই বুঝি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে।

শোভনলাল চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"বীরেন্দ্র, শীগ্‌গির—"

তার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই গরীলাটা আরও দু'পা এগিয়ে এল। বীরেন্দ্রও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গুলি কর্‌লে। কিন্তু বন্দুকের ট্রিগার টেপাই সার হ'ল; ক্যাপে আগুন ধর্‌ল না। গরীলাটা একটা হুঙ্কার ছেড়ে তাদের কাছে—হাত চারেকের মধ্যে এসে পড়্‌ল। বীরেন্দ্র আর একটা ট্রিগার টিপ্‌ল—সেটিতেও আওয়াজ হ'ল না। গরীলাটা বীরেন্দ্রকে ধর্‌বার জন্য একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে। বীরেন্দ্রও আর

কোন উপায় না দেখে গরীলাটার বুকে তার বন্দুকটা ছুঁড়ে



মারলে। গরীলাটা খপ্ ক'রে বন্দুকটা ধ'রে মড়াৎ ক'রে ভেঙে, দাঁত দিয়ে তার নলটা চেপ্টে ফেলে—বীরেন্দ্রকে হাত

বাড়িয়ে ধর্‌তে যেতেই রতনের বন্দুকের গুলিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। গুলিটা তার হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে চ'লে গেল।

সে-দিন তা'রা আরও চারটে গরীলা শিকার কর্‌লে। সকলকে খেতেও হ'ল গরীলার পোড়া মাংস।

রাতের বেলা বীরেন্দ্র বল্লে—"যে রকম ব্যাপার দেখ্‌ছি, এ বনে বেশীদিন থাক্‌লে শেষকালে হয়ত সাপও খেতে হবে। এবার চল বাড়ী ফেরা যাক্!"

কিন্তু শোভনলালের তখনও গরীলা-শিকারের সখ মেটে নি। সে বল্লে—"আরও দিন দুই থাকা যাক্।"

মঙ্গরু বল্লে—"হুজুর, এ অঞ্চলের নিগ্রোরা মানুষ খায়। কোন্ সময়ে যে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়্‌বে, ঠিক নেই।"

তবু শোভনলালের ইচ্ছামত ঠিক হ'ল, পরের দিনটি মাত্র তা'রা থাক্‌বে।

পরদিন সকাল হতেই শোভনলাল কারুকে কিছু না জানিয়ে একা সেই বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। প্রায় মাইলখানেক চল্‌বার পর, হঠাৎ এক জায়গায় দেখ্‌লে গাছের ডালপালা ভাঙা—আর মাটির ওপর গরীলার পায়ের দাগ। জায়গাটা জলা—গরীলাটা কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে চ'লে গেছে। শোভনলালের একবার ইচ্ছা হ'ল—বন্ধুদের কাছে ফিরে যায়। একা এমন দুঃসাহসে কাজ নেই। আবার

ভাব্‌লে ভয় কিসের? যার মনে সাহস নেই, সে আবার মানুষ? সে খুব সতর্ক হয়ে এগিয়ে চল্‌ল।

কিন্তু তাকে বেশীদূর যেতে হ'ল না। চল্‌তে চল্‌তে মাত্র হাত পঞ্চাশেক দূরেই গরীলাটার একেবারে সম্মুখে গিয়ে পড়্‌ল। গরীলাটা তখন ব'সে ব'সে নিশ্চিন্তমনে গাছ থেকে কচি কচি পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। শোভনলালকে দেখেই সবগুলো দাঁত বা'র ক'রে চোখ ঘুরিয়ে উঠে' দাঁড়িয়ে এক হুঙ্কার ছাড়্‌লে। তারপর বুকের ওপর ধুম্‌ধুম্ শব্দে ঘুষি মার্‌তে মার্‌তে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। একটু ক'রে এগিয়ে আসে আর দাঁড়ায়; আবার বসে, আবার উঠে' দাঁড়ায়। হুঙ্কার ও ঘুষির বিরাম নেই। শোভনলাল কিন্তু স্থির—তার বুক লক্ষ্য ক'রে বন্দুক তুলে রইল। গরীলাটা তার সাম্‌নে হাত দশেকের মধ্যে এসে পড়্‌তেই সে গুলি কর্‌লে—পর পর দুটো। কিন্তু তাতে গরীলাটা পড়া তো দূরের কথা, একটুও কাতর না হয়ে শোভনলালের দিকে ছুটে' এল। শোভনলালও নিমেষে কোমর থেকে বড় ছোরাখানা খুলে নিলে এবং গরীলাটা তার মাথা লক্ষ্য ক'রে ঘুষি চালাতেই সে চক্ষের পলকে ছোরাখানা জন্তুটার বুকের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বন্দুকহাতে ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে স'রে দাঁড়াল। ঘুষিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়্‌ল—শোভনলালের

বাঁ হাতখানার ওপর। সে প্রচণ্ড আঘাতে তার হাতখানা



ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। শোভনলাল ছিট্‌কে হাত কয়েক দূরে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল।

ওদিকেও এক বিপদ্। বন্ধুরা শোভনলালকে অনেকক্ষণ না দেখে চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ল। ডেম্বা ও মঙ্গরুও কিছুক্ষণ হ'ল বনের মধ্যে ঘুর্‌তে গেছে। তা'রাও আর আসে না যে শোভন-লালের সন্ধানে পাঠায়। আর এ গহন বনে কোথায়ই বা তার সন্ধান পাবে? বেলাও ক্রমে বেড়ে চলেছে।

হঠাৎ মঙ্গরু ও ডেম্বা ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—"হুজুর, শীগ্‌গির পালান, একদল রাক্ষুসে নিগ্রো এই দিকেই আস্‌ছে। আর মাত্র মাইল খানেক দূরে—"

—"কিন্তু শোভনলাল? তাকে ফেলে কি ক'রে যাব?"

ডেম্বা বল্লে—"তাকে সকালে এই দিকে যেতে দেখেছি।"

বীরেন্দ্র বল্লে—"তবে আপাততঃ এই দিকেই চল।"

তা'রা সেই দিকে ছুটে' চল্‌ল।

ইতিমধ্যে শোভনলালের জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে উঠে' ব'সেই তাকিয়ে দেখে গরীলাটা কিছুদূরে ঝোপের ধারে প'ড়ে আছে। কিন্তু তখন তার হাতে দারুণ যন্ত্রণা। গরীলাটার দিকে মনোযোগ দেবার শক্তি ছিল না। সে রুমাল দিয়ে ভাঙা হাতখানা নিজের গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধে, ছোরাখানা গরীলাটার বুক থেকে টেনে তুলে—খাপের মধ্যে পুরলে। তারপর ডান হাতে বন্দুকটা ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্‌ল।

বীরেন্দ্ররাও দৌড়্‌তে দৌড়্‌তে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এসে পড়্‌ল। কিন্তু ঝোপের ওপার থেকে শোভনলালকে মনে করলে বুঝি গরীলা। তা'রা আর না এগিয়ে সেখানেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে। শোভনলাল কিন্তু তাদের উপস্থিতি বুঝ্‌তে পারলে না। সে এক এক পা যায়, আর দাঁড়ায়; থেকে থেকে দারুণ যন্ত্রণায় কাত্‌রে ওঠে।

বীরেন্দ্র চুপি চুপি বল্লে—"এ যে বড় মজার গরীলা!"

মঙ্গরু এতক্ষণ ঝোপের ফাঁক দিয়ে এই মজার গরীলাটাকে দেখ্‌বার চেষ্টা করছিল। সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—"গরীলা নয়—বড় হুজুর—হুজুর!"

তার কথা শুনে দু'বন্ধু সমুখের দিকে তাকিয়ে দেখে শোভনলাল—হাত ভাঙা, রক্তে পোষাক ভিজে গেছে। তা'রা বন্দুক নামিয়ে ছুটে' গিয়ে শোভনলালকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু তখন আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে দূর থেকে রাক্ষসগুলোর বিকট চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সংক্ষেপে শোভনলালকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লে তা'রা দু'জনে তাকে কাঁধে তুলে নিলে। কিন্তু যাবে কোন্ দিকে?

মঙ্গরু বল্লে—"লুইলো নদী এখান থেকে একদিনের পথ। সেইদিকেই চলুন—নদীতে ক্যানো পাওয়া যাবে। ঐ

পাহাড়ের কোল দিয়ে উপত্যকার ওপর দিয়ে আমাদের পথ-বরাবর দক্ষিণ দিকে। চলুন—হুজুর—চলুন। ঐ রাক্ষসদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। এল—তা'রা এল—চলুন—"



শোভনলালকে কাঁধে নিয়ে তা'রা সেই দিক্ পা চল্‌তে লাগ্‌ল।

—শেষ—